মহর্ষি মনসুর

'মহর্ষি মন্‌সুর' সম্বন্ধে অভিমত

"ধর্ম্মবীর মহাত্মা মন্‌সুরের অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী—বিষয়টী যেমন সুন্দর, ঘটনাবলী যেরূপ চিত্তাকর্ষক, লেখাও তদনুরূপ প্রাঞ্জল হইয়াছে।"—**বসুমতী**

"সময়ে সময়ে এইরূপ স্বাধীন চিন্তাক্ষম জ্ঞানীর উদ্ভব হইয়া কলের পুতুলের ন্যায় স্থায়ী নিয়ম-পালন-তৎপর গতানুগতিক জন-সমাজকে নিজে ভাবিয়া কাজ করিতে, বিশ্বাস অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইঁহারা কোন দেশ বা কালে আবদ্ধ নহেন; ইঁহাদের চরিত-কথা বিশ্বের সকল সম্প্রদায়েরই অনুশীলন ও অনুধ্যানের বিষয়। লেখক বিশুদ্ধ বাংলায় এই মহর্ষির উপদেশ, ধর্ম্মমত, শিক্ষা প্রভৃতির সহিত তাঁহার জীবন-কথা বর্ণন করিয়াছেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাবিবার শিখিবার অনেক বিষয় পাইবেন।"—**প্রবাসী**

"মোজাম্মেল হক্ সাহেব উৎকৃষ্ট বাংলায় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সমালোচ্য পুস্তকখানি সাধারণের নিকট যে আদৃত হইয়াছে, ইহার তৃতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। এই জীবনীখানিতে পড়িবার, বুঝিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে।"—**মানসী ও মর্ম্মবাণী**

"পুস্তকখানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। ভাষা মার্জ্জিত। আলোচ্য বিষয় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর একটী সাধক বৈদান্তিকের জীবনী। এরূপ মহাত্মার পবিত্র চরিত পাঠে সকল জাতীয়েরই উপকার আছে।"—**এডুকেশন গেজেট**

"The author has laboured long in the domain of literature, producing things of utility and interest and although in most cases the labours of his brother literateurs have equally gone without deserving reward, we hope the public will give this (3rd) edition of his book a reassuring encouragement. The author needs no introduction and we conclude by recommending his book to our readers, particularly to those who require to be enlightened with things Islamic and connected with the followers of the Islamic faith."

—*The Mussalman*

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত

মহর্ষি মন্‌সুর

ধর্ম্মবীর মহাত্মা মন্‌সুর হাল্লাজের অলৌকিক
জীবন-কাহিনী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব পরীক্ষক,
শাহ্‌নামা, ফেরদৌসী-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

প্রণীত

'ভূ-প্রদক্ষিণ'-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার মহাশয়
কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা-ভূষিত

মোসলেম পাব্‌লিশিং হাউস্‌
কলেজ স্কয়ার (ইষ্ট); কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক—এম. আফজাল্-উল হক্
৩, কলেজ স্কয়ার (ইষ্ট) ; কলিকাতা

অষ্টম সংস্করণ
১৯৪৫

প্রিণ্টার— শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস লিঃ
২৫নং ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

অনেক দিন পূর্ব্বে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু নানারূপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইহা তৎকালে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করি নাই। সম্প্রতি কয়েক জন গুণগ্রাহী বন্ধু ইহার হস্তলিপি দর্শনে মুদ্রাঙ্কনার্থ উপদেশ দেন। তাঁহাদের উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া আজ আমার পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম,—গ্রন্থ প্রচারিত হইল। কিন্তু অদৃষ্টে কি আছে, কে বলিতে পারে?

ইহা কোন গ্রন্থ-বিশেষের অনুবাদ নহে। একখানি উর্দ্দু পুস্তিকার মর্ম্মাবলম্বনে অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য লইয়া স্বাধীনভাবে রচিত হইয়াছে। সাময়িক রুচির অনুরোধে স্থানে স্থানে নূতন বর্ণনার সংযোগ করা গিয়াছে। বোধ করি, ইহাতে অন্যায় কিছুই হয় নাই। এক্ষণে এতদ্দ্বারা সেই সাধুকুলশিরোমণি মহাত্মা হোসেন মনসুরের পবিত্র নামের পাছে কোন অসম্ভ্রম হয়, ইহাই ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতেছি। গ্রন্থ-মধ্যে কোন কোন স্থলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথার উল্লেখ আছে। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কুত্রাপি কোনরূপ দোষাশ্রয় ঘটিয়া থাকে, তবে দয়াময় জগদীশ্বর যেন এ দীন অজ্ঞানান্ধের সে অপরাধ ক্ষমা করেন, ইহাই সানুনয় প্রার্থনা। সহৃদয় মুসলমান সমাজও উক্ত ত্রুটি পরিহারার্থ বা ইহার ভ্রম-প্রমাদ পরিবর্জ্জন ও উৎকর্ষ বিধানার্থ বন্ধুভাবে উপদেশ দিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিব। এক্ষণে দয়াময়ের কৃপায় ইহার উপর সাধারণের স্নেহদৃষ্টি পড়িলেই আমার পরিশ্রম পুরস্কৃত হইল, বিবেচনা করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ইহার রচনাকালে শান্তিপুর জুবিলী মাদ্রাসার পারস্য-শিক্ষক জনাব হাজী মৌলভী মোহাম্মদ অবায়েদুল্লাহ্ সাহেবের অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শান্তিপুর—নদীয়া
৯ই আষাঢ়; ১৩০৩

বিনীত—
মোজাম্মেল হক্

তৃতীয় সংস্করণের কথা

করুণাময় বিধাতার অনুগ্রহে এই পবিত্র চরিতাখ্যানের আর একটী সংস্করণ হইল। এই সংস্করণে ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং কয়েকটী জটিল ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহাতে গ্রন্থ-সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ ছিল না, এবারে সে ত্রুটি পরিহার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এবার ইহাতে প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত একটী গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে।

সে আজ অনেক দিনের কথা, যখন শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয় ফয়জাবাদে ছিলেন, তখন তিনি 'মহর্ষি মনসুর' পাঠে আমাকে লিখিয়াছিলেন,—"আপনার লেখাতে লালিত্য ও প্রাণ আছে দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। মহাত্মা মনসুর সম্বন্ধে অনেক মুসলমান ভ্রাতাকে প্রশ্ন করিয়া কোন প্রকার সঠিক সংবাদ পাই নাই। আপনার দ্বারা আজ সে অভাব মোচন হইল। আপনি বঙ্গের এক জন প্রকৃত সুসন্তান।" গ্রন্থ সম্বন্ধে ঈদৃশ অনুকূল মত থাকায় আমি মাননীয় পরিব্রাজক মহাশয়কে ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আশা পূর্ণ করিয়াছেন; তাঁহার ভূমিকা-সংযোগে এ গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। ফলতঃ ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব সাধনার্থ যত্নের ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে সকলে ইহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে। ইতি

শান্তিপুর
৭ই জ্যৈষ্ঠ ; ১৩২৩

সাধারণের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী—
গ্রন্থকার

চতুর্থ সংস্করণের কথা

বাঙ্গলার এই উপন্যাসের যুগে এই মহাপুরুষ-জীবনীর যে দুই বৎসরের মধ্যেই অন্য একটী সংস্করণের প্রয়োজন হইল, ইহা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা এবং পাঠক-সাধারণের পক্ষে গৌরবের কথা বলিতে হইবে ; কেননা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহাপুরুষের কথা অক্ষম লেখনীপ্রসূত হইলেও পাঠকগণ তাহা বরণ করিয়া লইতে পশ্চাৎপদ হন না।

শান্তিপুর
ফাল্গুন ; ১৩২৫

বিনীত—
গ্রন্থকার

সূচিপত্র

ভূমিকা

"কহে মন্সুর সুন্ কাজী, গায়ের কা পেয়ালা মাৎ পি।
'আনাল হক্' পর হো তু সাবিদ্, ওহি কল্মা পঢ়াতা যা।" *

আজ অতীব আনন্দের সহিত এই মুখবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই শ্রেণীর এবংবিধ আনন্দ আমি ইতিপূর্ব্বে কখন অনুভব করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কেন যে আমার প্রতি এই ভার অর্পিত হইয়াছে, কিছুই জানি না। যেহেতু আমার দৃঢ় ধারণা যে, আমি কোন প্রকারেই এই মহৎ কার্য্যের উপযুক্ত নহি। যে মহাপুরুষের জীবন-চরিত এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়, তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার অধিকার এ রসনায় আছে কি না, সমূহ সন্দেহ। তবে কেন যে এই কাজে হাত দিতে হইল, তাহা বিধাতাই জানেন। সুপণ্ডিত ধর্ম্মপ্রাণ গ্রন্থকর্ত্তা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ইহার ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করায় আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি। আমি এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইতে চলিল, মুসলমানগণ পুণ্যভূমি ভারতে প্রথমে পদার্পণ করেন। এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে তাঁহারা লক্ষ লক্ষ ভারতসন্তানকে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ইস্‌লাম-শিষ্যগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার ফলে

* মন্সুর কহেন, শুন কাজি, অপরের পেয়ালা পান করিও না। সোঽহম্-বাদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেই মন্ত্র পড়াইতে থাক।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি এখন সমানভাবে ভারতের অধিকারী, বলিতে হইবে। বাস্তবিক অনার্য্য হাড়ী, বাগ্দী, মুচী, বাউরী, ডোম প্রভৃতি এবং আদিম অধিবাসী সাঁওতাল, ভীল, কোলাদি জাতিকে বাদ দিলে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান হইয়া দাঁড়ায়।

মুসলমান ভ্রাতাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি আরবী ভাষায় লিখিত। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারা সেই প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন। যদিও বহু মুসলমান আরব, পারস্য, তুরস্ক, তাতার, কাবুল প্রভৃতি ভারত-বহির্ভূত রাজ্যসমূহ হইতে আসিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের বংশধরগণ তত্তৎ দেশের ভাষা ব্যবহার করেন নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দিল্লীপ্রসূত উর্দ্দু ভাষাই তত্রত্য মুসলমানদের মাতৃভাষা হইয়াছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানগণ আপনাদের প্রাদেশিক ভাষাতেই কথাবার্ত্তা ও বাহিরের কাজ-কর্ম্ম চালাইয়া থাকেন। কিন্তু সেই ভাষাতে ব্যুৎপত্তি লাভের চেষ্টা করেন না। তবে যাঁহারা সাহিত্য-জগতে খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে অভিলাষী, তাঁহারা উর্দ্দু ভাষার চর্চ্চাতেই নিযুক্ত। এরূপ স্থলে বঙ্গীয় মুসলমানগণকে বঙ্গভাষাকে আপনাদের মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করত তাহার উন্নতিকল্পে যত্নবান হইতে দেখিলে কাহার না আনন্দ জন্মিয়া থাকে? বাস্তবিক মাতৃস্তন-পানের সহিত মানুষ যে ভাষা শিক্ষা করে ও যে ভাষায় ঘরে-বাহিরে কাজ-কর্ম্ম চালায়, তাহাই তাহার মাতৃভাষা এবং সেই ভাষার অনুশীলন দ্বারা উন্নতি সাধন করা সকলেরই কর্ত্তব্য; নচেৎ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। সুখের বিষয়, বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃগণের অনেকে বহু দিন হইতে বঙ্গভাষার অনুশীলন করিতেছেন এবং কেহ কেহ উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থকার মধ্যে স্থানও পাইয়াছেন। তন্মধ্যে এই

'মহর্ষি-মনসুর' গ্রন্থের প্রণেতা একজন। ইনি বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। ইহাঁর 'মহর্ষি মনসুর' গ্রন্থ পাঠে আমরা বিশেষ উপকার ও আনন্দলাভ করিয়াছি।

কোন সঙ্কীর্ণ-হৃদয় গোঁড়া হিন্দু হয়তো পুস্তকের নামকরণে 'মহর্ষি' শব্দ দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ ও আপত্তি করিতে পারেন। কারণ তাঁহাদের ধারণা, মহর্ষি বলিলেই কেবল ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের আর্য্য মহাপুরুষগণকেই বুঝাইয়া থাকে ;—পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর সিদ্ধ মহাপুরুষ থাকাটা যেন তাঁহারা অসম্ভব মনে করেন। তাই তাঁহারা মহাত্মা মনসুরকে মহর্ষি আখ্যা দিতে নারাজ। এরূপ অনুদার মত যাঁহারা পোষণ করিয়া সুখ-বোধ করেন, তাঁহাদিগের সেই মত বা বিশ্বাস কোন ক্রমেই সঙ্গত ও সমীচীন নহে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশে হিন্দু-সমাজের বাহিরে অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বহু ঋষিকল্প মহাপুরুষ জন্মিয়া গিয়াছেন এবং এখনও আছেন। মহর্ষি মনসুর এক জন সেই শ্রেণীর স্বনামধন্য মহাজীব। তিনি খলিফাদের রাজধানী প্রাচীন বাগ্দাদ নগরের অদূর-স্থিত একটী পল্লীতে কোন 'সুফী'-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

'সুফী' শব্দের অর্থ তত্ত্বদর্শী। উহা সম্ভবতঃ গ্রীক 'সোফিয়া' (Sophia—wisdom) শব্দ হইতে আরবী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলেন যে, ইস্লাম-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরব, তাতার, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে অনেক অদ্বৈতবাদী পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন। কালক্রমে উক্ত দেশসমূহে ইস্লাম প্রচারিত হইলে সেই অদ্বৈতবাদীরা ইস্লাম গ্রহণ করত 'সুফী' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, অনেক গোঁড়া মুসলমান সুফীদিগকে ইস্লামের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া বিদ্বেষ পোষণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

তাঁহারা বিরুদ্ধবাদী নহেন, তাঁহারা ইস্‌লামের এক উন্নত জ্ঞানী অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়। তজ্জন্য আবার অধিকাংশ মুসলমান তাঁহাদিগকে আন্তরিক ভক্তি ও সম্মান করেন।

ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, সকল ধর্ম্মেরই দুইটী বিভাগ আছে। একটী বাহ্য (Exoteric) এবং অপরটী অন্তরঙ্গ বা গুপ্ত (Esoteric)। সুফীগণ ইস্‌লাম ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ বা গুহ্য তত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী পুরুষ। ধর্ম্মজগৎ ও বিশ্বের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে ইঁহারা কেবল গুরুমুখে উপদেশ পাইয়া থাকেন। এই গুপ্ততত্ত্ব-বিদ্যায় প্রবিষ্ট লোক-সকল যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, তাঁহারা সকলেই এক মতাবলম্বী—তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্নতা নাই। ব্যোমযানারোহণে খুব উচ্চ আকাশে উঠিলে যেমন দৃষ্টির সীমা প্রসারিত হয়, নিম্নস্থ বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা, ক্ষেত-খোলা, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, হ্রদ-সরোবরাদি সমস্তই এক-ভাবাপন্ন দেখায়, কাহারও সহিত কাহারও পার্থক্য অনুভব করা যায় না, এস্থলে ঠিক তাহাই ঘটে। যাঁহারা বাহ্য বিষয় লইয়াই ব্যস্ত, সুতরাং নিম্নে থাকেন, তাঁহারাই জড়জগতের সম্পত্তির মত ধর্ম্মরাজ্যের বিত্ত-বিভবকেও "এটা আমার, ওটা তোমার, সেটা তার" ইত্যাকার পার্থক্যবাচক শব্দ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা স্থাপনের প্রয়াস পান। কিন্তু যাঁহারা উচ্চে উঠিয়া অন্তরঙ্গ-নিহিত গূঢ় সত্যসমূহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা একেবারে ভেদ-জ্ঞান-বিরহিত। এমতাবস্থায় বেদান্ত-প্রতিপাদ্য মহা-বাক্য 'সোঽহম্' এবং মহাতপা মহর্ষি মনসুর-প্রচারিত 'আনাল হক্' যে এক-সুরে সাধা তান, তাহাতে আর বৈচিত্র্য বা সন্দেহ কি আছে?

মনসুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সৈয়দ জুনেদ শাহের অলৌকিক জ্ঞানধর্ম্মের বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার সমীপে গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁহার

চিত্তের এমন একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে যে, তদ্দর্শনে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই পরিবর্ত্তন ও অলৌকিক কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণে অনেককেই তাঁহার নিকট নতমস্তক হইতে হইয়াছিল। ধনকুবের বা পদ-মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত মনসুরকে দেখিলে যেন উপর হইতে কোন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমুচিত সম্মান দিতে বাধ্য হইতেন। এই ভাবে কিছু দিন কাটিয়া যাওয়ার পর মনসুর মক্কা যাত্রা করেন। এরূপ শুনা যায় যে, তথায় তিনি এক বৎসরকাল কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন—ধর্ম্মমন্দির কা'বার সম্মুখে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্রে ও রজনীর শিশিরে বিনা আচ্ছাদনে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। আহার ছিল দিনান্তে সামান্য এক টুকরা রুটি মাত্র। এই ব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক কিছু দিন অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়া আবার মক্কা ধামে গমন করেন।

অতঃপর তিনি বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া কোথায় কি কার্য্য করেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ভারতীয় উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে দুইটী কবিতা মাত্র আমরা শুনিতে পাই। একটী সঙ্গীতাকারে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বাইজীদের মুখে গীত হইয়া থাকে।* অপরটী একটু দীর্ঘ—তাঁহার অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যারূপে মৌলভী সাহেবদের মুখে শুনা যায়।† তাহারই শেষাংশ প্রবন্ধের শিরোদেশে প্রদত্ত হইয়াছে। দেশ পর্য্যটনান্তর বাগ্দাদে ফিরিয়া আসিবার পর মনসুরের ধর্ম্মোন্মত্ততার মাত্রা বেশী পরিমাণে প্রকাশ পাইল। একদা তিনি গুরু জনেদ

* মোকদ্দাব্ আপ্‌না আপ্‌না আজমা লে যিস্‌কা জী চাহে" ইত্যাদি।

† "আগার হ্যায় শওক্ মিল্‌নেকা. তো হরদম্ লও লাগাতা যা" ইত্যাদি।

শাহ্‌কে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধীয় এমন একটী কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে, তদুত্তরে গুরুকে বলিতে হইল,—"মনসুর ! সাবধান, রসনাকে শাসনে রাখিও। নতুবা, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, কোন্ দিন তুমি রাজাজ্ঞায় প্রাণ হারাইবে।" গুরুর নিকট উৎসাহ না পাইয়া মনসুর নির্জ্জন প্রদেশে যোগাবলম্বন করত সমাধিস্থ হইলেন। কয়েক বৎসর তিনি যোগাসনে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে নীরব নিষ্পন্দভাবে বাহ্যজ্ঞান-শূন্যাবস্থায় থাকিয়া হঠাৎ এক দিন প্রেমের পূর্ণ আবেশে অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"আনাল হক্" (অহম্ ব্রহ্মাস্মি)। এই সংবাদ বাগ্দাদের চতুর্দ্দিকে বিদ্যুদ্বেগে ছড়াইয়া পড়িল; আবালবৃদ্ধবনিতা এক মুখে বলিতে লাগিল,—"কি স্পর্দ্ধার কথা! ক্ষুদ্র মানব হইয়া ঈশ্বরত্বের অধিকার! ভক্তের কি এই উক্তি? ইহা নিশ্চয় বাতুলের প্রলাপ; মনসুর নিঃসন্দেহ পাগল হইয়াছেন।"

মনসুর যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, সাধারণে তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? এত বড় একটা দার্শনিক সত্য তখনকার বাগ্দাদী লোকের পক্ষে অবোধ্য হওয়াতে তত দোষের হয় নাই। কিন্তু আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই বা কয় জন সেই 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন? সাধারণভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই প্রচার করিয়া থাকেন এবং সকলে উহা মোটামুটি বুঝিতেও পারেন। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের গূঢ়ার্থ উন্নত দার্শনিক ব্যতীত আর কাহারও বোধগম্য হইতে পারে না। সাধারণ লোকে যদি বুঝিতে চায়, তবে তাহাদের 'ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ' হইয়া থাকে। এই জন্যই বুঝি, ভারতের তত্ত্বজ্ঞানিগণ মুর্খকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে ভূয়ো-ভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। মনসুরের গুরু জুনেদও এই গভীর দার্শনিক সত্য সাধারণ্যে প্রচার করিতে মনসুরকে বারংবার

বারণ করিয়াছিলেন। পরন্তু সেই মহাপ্রাণ সরল সাধুপুরুষ হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া বাধা মানিতে অক্ষম হইয়াছিলেন।

মনসুরের হিতাকাঙ্ক্ষীমাত্রেই তাঁহাকে কত রকমে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কান দেন না—কেবল ঊর্দ্ধনেত্রে 'আনাল হক্' বাক্যোচ্চারণ করেন। এক দিন বহু সংখ্যক বন্ধু একত্র হইয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল এবং নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া নিষেধব্যঞ্জক উপদেশ দিতে লাগিল। তদুত্তরে মন্‌সুর বলিলেন,—"আমার আবার জীবনের আশা কিসের? আমার কি জীবন আছে? আমি তো বহু দিন হইল জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছি! মৃত ব্যক্তির কিসের ভয়? যদি তোমরা বল,—তোমার দেহ ও প্রাণ আছে, নতুবা কথা কহিতেছ কি প্রকারে? কিন্তু ভাই সে দেহ ও প্রাণ তুচ্ছ জিনিস। যাহা এই আছে, এই নাই, তাহার আবার মূল্য কি? সামান্য কাচখণ্ডের বিনিময়েও তাহা কেনা যায় না। তাহার জন্য ভয় কি? তাহার মমত্ব-যত্নই বা কি নিমিত্ত!" এবংবিধ নির্ভীকতা প্রকাশ করত সকলকে স্তম্ভিত করিলেন এবং সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া নক্ষত্র-বেগে বাহিরে আসিয়া আবার সেই প্রাণপ্রিয় 'আনাল্ হক্' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পলায়ন করিলেন।

মন্‌সুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এক জন তপস্বিনী ছিলেন। তিনিও এই মহাসত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতার ন্যায় প্রেমে উন্মাদিনী হয়েন নাই। তিনি মন্‌সুরের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করত ভ্রাতাকে একদা বলিয়াছিলেন,—"আমি তো বেগ ধারণ করিয়া আছি, তুমি কেন এরূপ ক্ষেপিলে? আমি বিশ বৎসর এই তত্ত্বসুধা পান করিতেছি, কিন্তু কখন মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তো বিচলিত হই নাই!" কে

কাহার কথা শোনে? মন্‌সুর অনবরত এক ধ্যানে 'আনাল হক্' প্রচার করিতে লাগিলেন।

সিন্ধুতে বিন্দু মিশাইয়া গেলে এক রূপ হয়, পরন্তু বিন্দু মধ্যে সিন্ধু প্রবেশ করিলে বিন্দু আপনাকে স্থির রাখিতে পারে কি না, ইহা ভাবুক জনের ভাবিবার বিষয়। এই জন্য কোন মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন,—

"বুঁদ সম্‌হানা সমন্দর মে, সো মানে সব কোই,
সমন্দর সম্‌হানা বুঁদ মে, পঁহুছে বিরলা কোই?"

যাহা হউক, মন্‌সুরের ব্যবহারে সাধারণ মুসলমান-সমাজ একেবারে ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, খোদা-তা'লা 'হফ্‌ত্‌ তবক্' আস্‌মানের উপর পবিত্র সিংহাসনে চির-বিরাজ করিতেছেন। মন্‌সুর কি প্রকারে তাঁহার পদে বসিতে পারেন? অতএব মন্‌সুর ঈশ্বরদ্রোহী, সুতরাং প্রাণদণ্ডার্হ। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট; পরমাত্মা মহান্, জীবাত্মা অণুবৎ। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, পরমাত্মার অধীন তাহাকে চিরদিনই থাকিতে হইবে। ইহাই ইস্‌লামের সাধারণ শিক্ষা। এরূপ স্থলে যদি কেহ 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্রেণীর লোকেরা তাহাকে ঘোর অপরাধী মহাপাপী মনে করিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত করিতে বাধ্য। মন্‌সুরের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। সাধারণ প্রকৃতিবর্গ খলিফার নিকট বারংবার বিচারপ্রার্থী হইয়াছিল। কিন্তু মন্‌সুরের ন্যায় বৈরাগী দরবেশের প্রতি কোন দণ্ডবিধান করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তিনি সর্ব্বজনপূজ্য ধর্ম্মাত্মা শাহ্‌ জুনেদের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। জুনেদ শাহ্‌ অনেকবার প্রত্যাখ্যানের পর শেষে নিতান্ত অনিচ্ছায় মন্‌সুর প্রাণদণ্ডার্হ বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করেন।

তখন সেই ধর্ম্মোন্মত্ত সাধক রাজাজ্ঞায় ধৃত ও কারারুদ্ধ হইলেন। কয়েকবার অলৌকিক শক্তি-প্রয়োগে তিনি কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া আবার স্বেচ্ছায় তথায় প্রবেশ করেন। অবশেষে বধ্যভূমিতে নীত হইয়া সহাস্য বদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করত ধর্ম্ম-প্রাণতার অক্ষয় উজ্জ্বল কীর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। ইহাই এ গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার এই অলৌকিক মর্ম্মস্পর্শী শোকাবহ ঘটনা বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এ উপহার উপাদেয়, অনুপম ও মূল্যবান্, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহর্ষি মন্‌সুরের অলৌকিক শক্তির যে সকল দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেগুলি তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট উপহসিত হইতে পারে। পরন্তু অনেক আধুনিক উচ্চ শ্রেণীর পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক উক্ত প্রকারের অলৌকিক ঘটনাবলী (Miracles) বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্বনামধন্য অধ্যাপক মিঃ ব্যারেট বলেন,—"তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে যে সকল অনৈসর্গিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় বিজ্ঞানের কঠোর নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে নহে।* এই কথা নিউটন, ফ্যারাডে, কেল্‌ভিন, ষ্টোক্‌স্‌, ম্যাক্স-

* "That a belief in the miracles of the gospel narrative is consistent with the most rigorous knowledge of the laws and continuity of Nature is shown by the public utterances of men like Newton, Faraday, Kelvin, Stokes, Clerk Maxwell and others.

"A miaracle is essentially the direct control by mind of matter outside the organism, in other words, a supernormal and incomprehensible manifestation of mind. As such miracles did not cease with the apostolic age, but have continued down to the present time.

ওয়েল প্রভৃতি বিজ্ঞান-জগতের মহারথিগণের উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। জড় জগতের উপর মানব-মনের মহাশক্তির প্রভাব দ্বারা এই শ্রেণীর ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে উহা সম্ভব ছিল এখন নাই, একথা সত্য নহে; মিরাকেল (Miracle) এখনও হইতেছে। মিরাকেল বিশ্বাসযোগ্য নয় বলিয়া উড়াইয়া দিলে জীবের জন্ম, দেহের পোষণাদি সুপরিচিত ব্যাপারসমূহের অসঙ্গত অলৌকিকতা স্বীকার করিতে হয়। ভুক্ত অন্ন কি প্রকারে রক্তাণুতে পরিণত হয় এবং তদ্দ্বারা জীব-দেহের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান কি প্রণালীতে গঠিত হয়, এ সকল কি কম Miracles ? কোন্ সিদ্ধান্ত রাসায়নিক তাঁহার প্রক্রিয়াগারের যন্ত্রাদি দ্বারা এক মুষ্টি তৃণকে দুগ্ধে পরিণত করিতে পারেন? পরন্তু

"To deny miracles because of their incredibility, is to deny the equally incredible but familiar phenomena of the nutrition, repair and reproduction of living organisms. What can be more incredible than the transmutation of our food into blood corpuscles and those corpuscles contributing the precise elements required to repair totally different tissues in our body. Ask the most accomplished chemist with all his laboratory appliances and wide knowledge, to turn a bundle of hay into even a single drop of milk and he acknowledges it to be impossible. But give the hay to the humble cow and the miracle is wrought. How ? Only by the inscrutable directive skill of the sub-conscious life of the animal, taking to pieces the millions upon millions of molecules that lie in the minutest fragment of hay and rearranging those molecules into a new complex structure—milk, adapted for a particular and predetermined end in view. What presumption to talk about the unfamiliar miracle being incredible, when these familiar miracles are so incredibly wonderful, that we are utterly unable to form any conception of the modus operandi."

—*Sir William Barret.*

গরুকে ঘাস খাওয়াইয়া আমরা তাহার নিকট হইতে দুগ্ধ লইয়া থাকি। পশুর অজ্ঞাতসারে কোন্ অদ্ভুত প্রক্রিয়া দ্বারা তৃণমুষ্টি তাহার পাকাশয়ে গমন করত নানা অবস্থার ভিতর দিয়া স্তনে উপনীত হইয়া দুগ্ধে পরিণত হয়? তৃণের পরমাণুগুলি কি উপায়ে দুগ্ধের পরমাণু হইল, ভাবিলে মানববুদ্ধি বিকল হইয়া যায়।

ফলতঃ মনসুর-জীবনের অনেক ঘটনাই অতীব আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। কাহার কাহার মনে সেগুলি সমস্ত না হউক, কোন কোন বিষয় অতিরঞ্জিত বা অলীক বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু না—যখন সেই সুদূর অতীতকাল হইতে এ পর্য্যন্ত মনসুর-জীবনী সম্বন্ধীয় অলৌকিক প্রবাদাদি অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে, তখন আর সে সকল অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই। তবে ইতিহাস ও জীবন-চরিতে কিছু-না-কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সেই সামান্য দোষের জন্য জাজ্বল্যমান সত্যের উপর অনাস্থা স্থাপন করা বিজ্ঞের কার্য্য নহে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন

মহর্ষি মনসুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

মরুময় পুণ্যদেশ আরবের উত্তরাংশে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ভুবনবিদিতা তুরস্কভূমি। তুরস্কের অগ্নিকোণস্থিত প্রদেশকে ইরাকে-আরবী কহে।* ইরাকে-আরবীর পূর্ব্ব সীমা-সংলগ্ন প্রদেশের নাম ইরাকে-আজ্জম, ইহা ইরাণ (পারস্য) রাজ্যের অন্তর্গত। ইরাকে-আজ্জম প্রদেশও শস্য-শ্যামল ও সৌন্দর্য্যের নিকেতন। সেই পুণ্যভূমির প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা, গুরুত্ব-মহিমা, শোভা-সমৃদ্ধি প্রভৃতির সৌসাদৃশ্য জগতে কোথাও আছে বলিয়া বোধ হয় না। এ ভূমিতে প্রকৃতি ভুবনমোহিনী বেশে নিত্য বিরাজিত। ইহার নশ্বর ললিত তরুলতিকা, নয়ন-রঞ্জন কুসুম-কানন ও সুরসাল ফলপূর্ণ শোভন উদ্যানসমূহ দেখিলে ইহাকে যেন ভূস্বর্গ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; বিয়োগ-বিধুর ব্যক্তি এখানে আসিলে সকল শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়। এমনি ইহার মোহিনী শক্তি! এমনি ইহার

* নদী-তীরবর্ত্তী প্রদেশের নাম ইরাক। ইরাকে-আরবীর মধ্যে ফোরাৎ (ইউফ্রেটিস্) ও দজ্‌লা (তাইগ্রীস্) নদী প্রবাহিত। জৈহুন নদী ইরাকে আজ্জম ভূমি সলিলসিক্ত করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

চিত্তচমৎকারী সৌন্দর্য্যের বিকাশ! এই বাহ্য সৌন্দর্য্য হইতেই আবার মানবের মানসিক সৌন্দর্য্য গঠিত হয়—মানব আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া থাকে। তাই বুঝি, এই সিদ্ধ স্থানে অনেক সুফী-সাধু জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে অমর কীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন; তাই বুঝি, এই ভূমির সেই বিশ্ববিদিত শুভ্রশ্রী শিরাজ ও তুস্‌ নগরের সুসন্তান পারস্য-কাব্য-কাননের কোমলকণ্ঠ কোকিল মহাত্মা শেখ সাদী ও মহাকবি ফেরদৌসী তুসী এবং ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষি খাজা হাফেজ শিরাজী এক দিন সুললিত তানে বিশ্ব-বসুধা মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আহা এক্ষণে তাঁহারা সেই ভূমিতেই কত কত মহাপ্রাণ সুধী পুরুষের সহিত চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন।

ইরাণের এই গৌরবমণ্ডিত প্রদেশের সান্নিধ্যে বয়জা নামে একটী পল্লী অবস্থিত। ইহা অন্য রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও বাগ্দাদ নগর হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। পূর্ব্ব কালে এই বয়জা পল্লীতে মন্‌সুর নামে এক অতি ধর্ম্মশীল বিচক্ষণ ব্যক্তি বাস করিতেন। সত্যনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতা গুণে পল্লীস্থ আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। শাস্ত্রানুমোদিত ধর্ম্ম-কর্ম্মসমূহ নিয়মিতরূপে প্রতিপালন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার পুণ্যহস্ত সাধ্যানুসারে দীন-দরিদ্রের অভাবমোচনে প্রশস্ত ও পরোপকারে উন্মুক্ত থাকিত। তিনি ক্ষুধার্ত্তকে আহার, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় প্রদান ও নিঃসহায়কে সাহায্য করাই ধর্ম্মের এক প্রধান

অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। প্রতিবাসিগণ তাঁহাকে সৌভাগ্য-বান্ পুরুষ জানিয়া চিরদিন তদীয় আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিত। ফলতঃ পরম-কারুণিক জগৎপিতা জগদীশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন; দয়াময়ের অনুগ্রহে তাঁহার কিছুরই অপ্রতুল ছিল না।

সহধর্ম্মিণী পূর্ণগর্ভা। সেই পতিব্রতা পুণ্যময়ী মহিলা তদবস্থার পালনীয় নিয়মসকল প্রতিপালনপূর্ব্বক অতি সন্তোষের সহিত গর্ভধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। অনন্তর যথাকালে শুভলগ্নে তাঁহার একটী সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত পরম সুন্দর তনয়রত্ন জন্মগ্রহণ করিলেন।* পুত্রের সুবিমল শশধরসন্নিভ কমনীয় কান্তিচ্ছটায় অন্তঃপুর প্রতিভাসিত—তদ্দর্শনে পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তানের শুভ কামনায় একান্তচিত্তে সর্ব্ব আনন্দদাতা বিশ্ববিধাতার উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় অবস্থানুযায়ী অর্থাদি বিতরণে দীন-দুঃখীদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিলেন। তাহারা পরিতুষ্ট হইয়া

---

* ইনি ঠিক কোন্ সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে অবধারণ করা কঠিন। তবে এইরূপ অনুমিত হয়, মহামান্য পুণ্যপ্রাণ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) আবির্ভাবের পর হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী ধর্ম্মপ্রাণ তাপস শেখ আবুবকর শিবলী হিজরী ৩৩৪ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। আবার গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, হজরত ওস্মানের পুত্র ওমরের সহিত তাঁহার অসদ্ভাব ঘটায় তিনি মক্কাভূমি পরিত্যাগ করিয়া বাগ্দাদে প্রস্থান করেন। এই ওমর কোন্ সময়ের লোক এবং মহর্ষি তাঁহার সমসাময়িক কি না, বিজ্ঞ পাঠকগণ তাঁহার মীমাংসা করিয়া লইবেন।

শিশুকে হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। গৃহ উল্লাসময়—হাস্যভরা! যেন স্বয়ং মূর্ত্তিমান আনন্দ আগমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। আজ যেন প্রচণ্ড-প্রতাপ দিনমণির কররাশি অধিকতর শুভ্র—অধিকতর উজ্জ্বল, অথচ শৈত্য-গুণ-বিশিষ্ট। আবার সুশীতল মলয়-মারুত মৃদুমন্দ প্রবাহে ঢলাঢলি করত স্ফূর্ত্তি প্রচারে তৎপর হইল। পুরবাসি-গণ এই শুভ দিনে আনন্দে উৎফুল্লপ্রাণ। প্রতিবাসী, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবেরাও সে উৎসবে যোগদান করিতে ত্রুটি করিল না। সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। হাস্য-কোলাহলে গৃহভূমি শব্দায়মান হইয়া উঠিল।

বিধাতার কৃপায় এবং জন-সাধারণের আন্তরিক আশীর্ব্বাদে এই ক্ষণজন্মা শিশু দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলসম্পন্ন হইতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার অঙ্গপুষ্টি ও অপরূপ রূপলাবণ্য পরিস্ফুট হইতে লাগিল, পিতামাতা পরম যত্নে তাঁহাকে লালন-পালন করিতে রহিলেন। আহা! এ জগতে ভবিতব্যতার কথা কে জানিতে পারে? যে মহাত্মা ঐশীশক্তি প্রভাবে অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া জগতকে বিমোহিত ও বিস্মিত করিয়া গিয়াছেন, যে দৃঢ়ব্রত সত্যপ্রিয় মহাপুরুষ ধ্যান-সমাধিতে নিমগ্ন থাকিয়া ধর্ম্মোন্মত্ততার চরম সীমায় সমুপস্থিত হইয়া অকাতরে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, যিনি তপস্বী-কুলের মহাতেজস্বী সিংহস্বরূপ ছিলেন, যাঁহার অপার্থিব বৈচিত্র্যময় জীবনবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে সর্ব্বাঙ্গ

রোমাঞ্চিত এবং হৃদয়-মন বিস্ময়াপ্লুত ও কি এক অভূতপূর্ব্বভাবে বিভোর হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, এই পুণ্য সূতিকাগারে শিশু-রূপে আজ তিনি আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্যবান্ পিতা অনন্তর যথাসময়ে একটী শুভ দিনে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতি সমারোহের সহিত তাঁহাদিগকে উপাদেয় পান-ভোজনে প্রীত করিলেন এবং শাস্ত্র-সঙ্গত বিধানানুসারে শিশুকে হোসেন মন্সুর নামে আখ্যাত করিলেন।*

হোসেন মন্সুর পরিশেষে যে এক জন ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি নামে বিখ্যাত হইবেন, প্রথম হইতেই তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। জন্মদিবসে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কি যেন এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রতিভাসিত এবং প্রাণমনোমুগ্ধকর অপার্থিব সৌগন্ধে গৃহ আমোদিত হইতে থাকে ও তদীয় হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর-প্রীতির জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ এক মধুময় ভাব সঞ্চারিত হয়। হাস্যে, ক্রন্দনে, ক্রীড়নে ও হস্তপদাদির সঞ্চালনে সেই ঐশিক প্রেম অভিব্যক্ত। দর্শক শিশুর ভাব-ভঙ্গী দেখিয়াই বিস্ময়াপন্ন ও অজ্ঞান! পিতা-মাতার আনন্দের অবধি নাই। আহা সে আনন্দ, সে স্বর্গীয় প্রফুল্লতা ঈদৃশ ক্ষণজন্মা পুত্রের ভাগ্যবান্ পিতা ব্যতীত কি অপর কেহ অনুভব করিতে পারে?

* ইঁহার পিতৃদত্ত নাম হোসেন। সুতরাং আরবীয় প্রথানুসারে পুত্রের নাম পিতার নাম-সংযুক্ত হইয়া হোসেন-বিন্-মন্সুর হইবারই কথা। কিন্তু তাহা হয় নাই—বিন্ শব্দটী লোপ হইয়া হোসেন মন্সুর এবং শেষে কেবল মন্সুর নামেই অভিহিত হন। আমরাও তজ্জন্য তাঁহার এই নাম ব্যবহার করিলাম।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে ক্রমেই শিশুর জ্ঞান-বিকাশ হইয়া, জিহ্বার জড়তা কাটিয়া গিয়া, মৃদু মধুর আধ আধ ভাষা দূরীভূত হইয়া বাক্যোচ্চারণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তখন বিজ্ঞ পিতা পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার্থ দেশের প্রথানুসারে মন্‌সুরকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন। কিন্তু কি এক অনিবার্য্য কারণ বশতঃ তিনি সপরিবারে বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতে বাধ্য হইলেন। এই স্থানে হোসেন মন্‌সুরের বিদ্যাশিক্ষার সুত্রপাত হয়, কিন্তু তাঁহার শিক্ষার পরিণতি হইয়াছিল সোস্তরে। সোস্তর-নিবাসী মহাত্মা সহল্‌-বিন্‌-আব-দুল্লাহ্‌ তৎকালে সুপণ্ডিত ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাধুতা ও শাস্ত্রাভিজ্ঞতা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মন্‌সুর সেই সুধী পুরুষের নিকটে আসিয়া আন্তরিক যত্ন ও প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে শিক্ষাগুণে যেমন তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইতে চলিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তদীয় অন্তরে ঈশ্বর-প্রীতি, সত্যনিষ্ঠা, গাম্ভীর্য্য ও ধর্ম্মচিন্তা ক্রমশঃ প্রবলরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি এমনই অসাধারণ প্রতিভাশালী, শান্তশীল ও স্মৃতিধর ছিলেন যে, সেই অনন্যদুষ্কর প্রজ্ঞাপ্রভাবে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই ধর্ম্মবিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

অতঃপর হোসেন মন্‌সুর শিক্ষাগুরু সহল্‌-বিন্‌-আব্‌দুল্লার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া ইরাকে-আরবীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

তৎকালে এই অঞ্চলে আধ্যাত্মিক বিদ্যার সমধিক চর্চ্চা হইত। সেখানকার বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি রত্ন-লাভাশায় সেই সুগভীর সাধন-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। মন্‌সুরও আসিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার অবিরাম সাধু-সংসর্গ ও তত্ত্বজ্ঞানালোচনা চলিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সুখ-সম্মিলনেও তিনি তৃপ্তি পাইলেন না; তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা—ধর্ম্মপিপাসা উপশমিত হইল না। ঔদাসীন্যের কি যেন এক গাঢ় কুহেলিকা—তত্ত্বানুসন্ধানের কি এক দৃঢ় আবরণ তাঁহার হৃদয়-ভূমি আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। তদীয় অনন্যদুষ্কর অধ্যবসায়-প্রসূত যশঃসৌরভে সকলে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইল বটে, তিনি সাধারণ্যে সমাদৃত ও প্রিয়পাত্ররূপে পরিগৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই ঔদাসীন্য-মেঘজাল অন্তরাকাশ হইতে অপসারিত হইল না, প্রবল ধর্ম্ম-পিপাসার শান্তি হইল না, আন্তরিক বাসনা চরিতার্থ হইল না। তখন তিনি এক জন উপযুক্ত দীক্ষাগুরুর আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ যথারীতি বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করেন, আর কোথা গেলে কিরূপে অভিলষণীয় দীক্ষাগুরু পাইবেন, এই চিন্তাতেই দিন-যামিনী ম্রিয়মাণভাবে ক্ষেপণ করেন। ভাবনার ভয়ানক কালিমা-রেখা তাঁহার বিস্তৃত ললাট-ফলকে নিয়ত পরিদৃশ্যমান থাকিত, সর্ব্বদাই অধোভাগে দৃষ্টি সংযোগ করিয়া কুঞ্চিতনেত্রে কি ভাবিতেন এবং স্বেচ্ছামত স্থানে স্থানে ধর্ম্মমন্দিরে গমনাগমন পূর্ব্বক আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চেষ্টায় ফিরিতেন।

বস্‌রা নগরী ইরাকে-আরবীর একটী প্রসিদ্ধ স্থান। তথাকার দৃশ্য-শোভা যেমন মনোরম, অধিবাসিগণও তেমনি সুধী-সজ্জন। সে ভূমি অনেক তত্ত্বালোকপূর্ণ তপস্বীর লীলাস্থলী। সেখানে গেলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে ভাবিয়া সত্যাকৃষ্ট মন্‌সুর বস্‌রা গমন করিলেন এবং ওমর-বিন্‌-ওস্‌মান নামক প্রসিদ্ধ সাধকের সংসর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন একটী তত্ত্ব-তর্ক লইয়া মতান্তর ঘটায় তিনি ক্ষুণ্নমনে বস্‌রা ত্যাগ করিয়া বাগ্দাদে উপনীত হইলেন।

বাগ্দাদ ইরাকে-আরবীর মধ্যে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ সুরম্য নগর। বাগ্দাদের অতুলনীয় সুষমাসমৃদ্ধি বর্ণনা করিয়া উঠে, কাহার সাধ্য? জগন্মান্য আব্বাস্‌বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা আবু জাফর মন্‌সুর ১৪৫ হিজরীতে এই নগর প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক এখানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধি ও সৌষ্ঠব সাধনার্থ রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতে মস্‌জিদ্‌রাজি, মিনারশ্রেণী, তোরণমালা, বিদ্যালয়বাটী, প্রমোদ-কানন, রাজপ্রাসাদ, সমাধিভবন ও অপরাপর সৌধ-নিচয় নির্ম্মিত হওয়ায় ইহা তৎকালে সৌন্দর্য্য-মহিমায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

মহানগর বাগ্দাদ প্রাকৃতিক দৃশ্য-শোভাতেও অতুলনীয়। ইহার চতুর্দ্দিকেই শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্র, কুসুম-গন্ধামোদিত উপবন, সুমিষ্ট ফলোদ্যান এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্রাম-বাটী। অদূরে কল্লোলময়ী ফোরাৎ (ইউফ্রেটিস্‌) নদী প্রবাহিত এবং নগরের

বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া নির্ম্মল-সলিলা তরঙ্গিনী দজ্‌লা (তাইগ্রীস্) উভয় তীরস্থিত সৌধমালার পাদদেশ বিধৌত করিতে নিয়ত নিরত। সুতরাং ইহার সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধির ইয়ত্তা কোথায়? ফলতঃ বিধাতার কৃপায় পুণ্য-হস্ত-প্রতিষ্ঠিত এই পুণ্যপ্রভান্বিত আদর্শ নগর কালে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতা-শিক্ষার কেন্দ্রভূমি, কত শত ধর্ম্মাত্মা সুফী-সাধুর লীলা-নিকেতন এবং ন্যায়বিচারক বিচক্ষণ নরপতি ও অদীনপরাক্রম বীরবৃন্দের সূতিকাগাররূপে পরিণত হইয়াছিল; ইহার নির্ম্মল যশঃসৌরভ ভূমণ্ডলের নর-নারীগণকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

মহাপ্রাণ মন্‌সুর বাগ্দাদের দৃশ্য-শোভা এবং নগরবাসীদের অমায়িক ভাব দর্শনে মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু স্বীয় বাসনা সাফল্যের দিকে আকৃষ্ট থাকায় তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। পরন্তু এ জগতে মঙ্গলময় বিধাতা কাহারও মনোভিলাষ অসম্পূর্ণ রাখেন না। তিনি ক্ষুধার্ত্তকে উপাদেয় আহার, তৃষ্ণাতুরকে সুশীতল বারি, অর্থপ্রার্থীকে বিপুল বিভব, ভোগবিলাসীকে ব্যসনসামগ্রী—ইত্যাদিক্রমে পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের অভিলষিত দ্রব্যাদি দানে পরিতুষ্ট করেন। তিনি প্রার্থনাপূর্ণকারী, একমাত্র দাতা ও পরম দয়াল। সুতরাং মন্‌সুরেরও যে এই বাসনা পূর্ণ করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? সৌভাগ্যক্রমে বাগ্দাদ নগরেই পবিত্র সৈয়দ-বংশাবতংস খাজা আবুল কাসেম আল্ জুনেদ শাহ্ নামে জনৈক অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পরমপণ্ডিত বাস করিতেন। তৎকালে তাঁহার সদৃশ

তত্ত্বদর্শী সিদ্ধ পুরুষ আর কেহই ছিলেন না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মের অতি গভীর গূঢ় বিষয়সমূহ তাঁহার নিকট নখ-দর্পণের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। তাঁহার শিষ্যশাখাও নিতান্ত কম ছিল না। তিনি নিয়ত তৎসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া মহানন্দে শাস্ত্রচর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

মনসুর মহাজ্ঞানী সৈয়দ জুনেদ শাহের গুণগ্রামের কথা অবগত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে তৎ-সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর সময়ানুসারে অতি নম্রভাবে সৈয়দ সাহেবের নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলে সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষ মনসুরের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়া কহিলেন,—"ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে অবস্থান করিলে করুণাময় জগৎ-স্রষ্টার কৃপায় তোমার বাসনা সফল হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই।" এতৎ অনুকূল বাক্য শ্রবণে মনসুরের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সর্ব্বসিদ্ধিকর্ত্তা নিখিলনাথকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে দিবা-রজনী গুরু-পদ-সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কিছু দিবস অতীত হইয়া গেল। মনসুরের ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগ, প্রগাঢ় গুরুভক্তি, চিত্তহারী বিনয়-নম্রতা এবং অচলা সহিষ্ণুতা দর্শনে সৈয়দ সাহেব নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার এতাদৃশ অসহ্য পরিশ্রমের পারিতোষিক প্রদান মানসে এক দিবস কৃপাবলোকনে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"মনসুর! আমি তোমার ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার অধ্যবসায়, তোমার গুরুভক্তি, তোমার

শিক্ষানুরাগ, তোমার চরিত্র-বল, তোমার আলাপ-সম্ভাষণ—সকলই মধুর, সকলই প্রশংসনীয় এবং অনুকরণযোগ্য। তোমার হৃদয়-ভাব অতি উচ্চ ও মহান্। জগতে পরিশ্রমের পুরস্কার অবশ্যই আছে। অতএব যাও, অবগাহন করিয়া আইস, আজ আমি তোমাকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব।"

গুরুর এই অনুকূল বাক্য শ্রবণে শান্তশীল মন্সুর হৃষ্টচিত্তে মস্তক অবনত করিয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং মঙ্গলময়ের অনুগ্রহে অদ্য আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল বলিয়া অবিলম্বে স্নানকার্য্য সমাপনান্তে শুদ্ধচিত্তে হস্তপদাদি প্রক্ষালন ('অজু') পূর্ব্বক অঙ্গশুদ্ধি করত পবিত্রভাবে পূজ্যপাদ গুরুর সম্মুখীন হইলেন। তখন মহানুভব সৈয়দ সাহেব শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থানুসারে মন্সুরকে প্রথমতঃ 'তওবা'* করাইয়া লইলেন। পরে ইহ-পরকালের কঠোর যন্ত্রণার পরিত্রাণ-পথ প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে একে একে তন্ন তন্ন করিয়া ধর্ম্মের যাবতীয় সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। সাধু-সমাজের স্পৃহণীয় আধ্যাত্মিক গুপ্ততত্ত্বের এরূপ বিশদ ব্যাখ্যা করিলেন যে, তাহাতে যেন মহান্‌শক্তি জগৎ-স্রষ্টার পবিত্র সত্ত্বা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন। ফলতঃ বীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ ফলপ্রসূ হয়, মন্সুরের পক্ষে এই গুরূপদেশও তদ্রূপ

* তওবা—অনুশোচনা বা কৃতাপরাধের জন্য জগৎস্রষ্টার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা এবং পুনর্ব্বার তাহা না করণের দৃঢ়তা।

ফলোপধায়ক ও শুভজনক হইল ; তিনি একাগ্রমনে তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। এইরূপে প্রসন্নচিত্তে আন্তরিক যত্ন ও স্নেহের সহিত হৃদয় খুলিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াতে হোসেন মন্‌সুরের অন্তরাকাশ পরিষ্কৃত ও জ্ঞান-নেত্র বিকশিত হইল। তাঁহার হৃদয়ের সেই তিমিরজাল অলক্ষ্যে অন্তর্হিত হইল, যেন কোন মোহনীয় মন্ত্রপ্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে কি এক অলৌকিক অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল। মন্‌সুর নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। একে তিনি স্বতঃই অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে আবার গুরুদত্ত শিক্ষাবল পাইয়া তাঁহার সেই স্বাভাবিক প্রখর প্রতিভা অধিকতর তেজস্বিনী হইয়া উঠিল; তিনি ঐশিক প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া একেবারে উন্মত্তবৎ হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
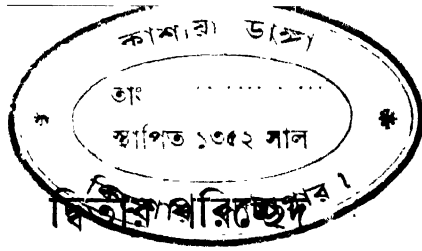
বিদ্যাবিশারদ গভীর-তত্ত্বজ্ঞ সাধুকুল-শ্রেষ্ঠ সৈয়দ খাজা জুনেদ শাহ্ কর্ত্তৃক দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া হোসেন মন্সুরের ধর্ম্মানু-রাগ ও জ্ঞানান্বেষণ-বাসনা অত্যধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল। তাঁহার চিত্তভূমি প্লাবিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিদ্যুল্লহরী আবির্ভূত হইতে লাগিল। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হওয়াতে তিনি নশ্বর জগতের মোহময় মায়াজাল ছিন্ন করিয়া আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অথবা আমি এ মর-জগতের কিছুই নহি বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হইতে লাগিল। ফলতঃ অচিরকাল মধ্যে তিনি দেশ-মধ্যে এক জন পরম তত্ত্বদর্শী ভাবুক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। সমগ্র খ্যাতনামা পণ্ডিত ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মন্সুরের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও অচিন্ত্যনীয় কার্য্যকলাপ দর্শনে বিস্মিত হইয়া নীরবে মস্তক অবনত করিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাঁহার শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম হইল না। অবিনশ্বর ধন পরমতত্ত্ব অবগত হইবার বাসনায় বহুসংখ্যক লোকের নিত্যসমাগম হইতে লাগিল; অনেকে অহর্নিশ তদীয় পদ-সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু তিনি নিরন্তর নেত্রযুগ নিমীলন করিয়া স্থিরচিত্তে বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া কি এক গভীর চিন্তায়

নিবিষ্ট থাকিতেন। সে যে কি চিন্তা, তাহা তিনি কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে কেবল সেই এক চিন্তা ব্যতীত অপর কিছুই স্থানলাভ করিতে পারিত না। দিবসে আহারে ব্যস্ত নহেন, নিশিতেও নিদ্রা বা বিশ্রাম নাই, কেবল অবিশ্রান্ত জাগ্রদবস্থায় স্তব্ধভাবে কি যে যোগসাধনে নিরত থাকিতেন, তাহা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ভাবুক ব্যতীত অপর সাধারণে বুঝিতে অক্ষম।

এই সময়ে মহর্ষি সাধু-সহবাসে অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভের বাসনায় দেশ-পর্য্যটনের কামনা করেন। তদনুসারে তিনি তস্তরে আগমন করিয়া তত্রত্য সাধুপ্রবর আবদুল্লাহ্ তস্তরীর সহবাসে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তৎপরে বস্‌রা, মক্কা, খোরাসান, শিস্তান, কেরমান, মাওরান্নাহার, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু দেশ ও বহু নগর পরিভ্রমণ করিয়া বহু সাধু লোকের সংসর্গ লাভ করেন। আমরা এস্থলে তাঁহার সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কয়েকটী অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

তপোধন বহুবার পবিত্র মক্কাভূমি পরিদর্শন ও তথায় অবস্থিতি করিয়া শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করেন। একবার তিনি চারি শত ধর্ম্মার্থী সহচর সহ তথায় গমন করেন এবং যথানিয়মে হজ্-ব্রত পালন পূর্ব্বক সঙ্গীদিগকে বিদায় দিয়া স্বয়ং মক্কাবাস করেন। এবার তিনি এই পুণ্যক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইয়া স্বীয় ধৈর্য্যশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি সুবিখ্যাত

বায়তোল্লা অর্থাৎ ধর্ম্মমন্দির কা'বা মস্‌জিদের সম্মুখভাগে সমস্ত দিবস প্রচণ্ড সৌর-রশ্মি-তলে অকাতরে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। শরীরে আচ্ছাদন মাত্র দিতেন না, প্রখর সূর্য্যের অগ্নিকণা সদৃশ অসহ্য কর-প্রভাবে তাঁহার শরীর বহিয়া সহস্রধারে স্বেদ-ধারা বিগলিত হইয়া ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত করিয়া ফেলিত এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। কষ্টের অবধি ছিল না; কিন্তু তাহাতেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নাই। তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল, চিত্ত বিকাররহিত ও উচ্চশির গিরি সদৃশ অদম্য, অচল ও অটল; মুখে আহা শব্দটীও বহির্গত হইত না। দিবানিশি কেবল প্রস্তর-প্রতিমাবৎ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। সেই সময়ে এক খণ্ড রুটীর সামান্য অংশ মাত্র তাঁহার দৈনিক আহার ছিল। এইরূপ কঠোর তপস্যায় মহাতপা মনস্থুর পূর্ণ এক বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। কি অবিচলিত অসাধারণ অধ্যবসায়! ইহা ভাবিয়া দেখিলেও মস্তক বিঘূর্ণিত ও সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠে; এরূপ অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা প্রকৃত সাধক ব্যতীত অপরের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে।

মহর্ষি মক্কা অবস্থানকালে একদা আরাফাতের প্রান্তরে প্রার্থনা করিতে গমন করেন। তথায় প্রার্থনাকালে বলেন, "হে করুণাময় জগৎপতে! হে বিশ্বপ্রাণ! হে প্রেমময় দীনবন্ধো! আমার কার্য্যকলাপের দ্বারা জগৎ যদি আমাকে মহাপাপী ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়াই পরিগণিত করিয়া থাকেন, তবে হে

দয়াময়! আমাকে সেই অবস্থাতেই উন্নতি করিতে শক্তি দান করুন।" এইরূপ বলিতে বলিতে সহসা তিনি তাঁহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি লোক দেখিতে পাইলেন; অমনি তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল,—কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন; নিকটে একটী বালুকাস্তূপ ছিল, ত্রস্তভাবে তাহারই অন্তরালে যাইয়া আত্মগোপন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তিনি দেখিলেন, প্রান্তর জনশূন্য হইয়াছে, প্রকৃতি নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে, দৃষ্টিসীমার মধ্যে মানবের চিহ্নমাত্র নাই, তখন তিনি বহির্গত হইয়া আবার ব্যাকুলচিত্তে কাতরকণ্ঠে অবিশ্রান্ত প্রার্থনায় নিরত হইলেন।

ঋষিবর কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। সংসারের আবল্য-জাল হইতে পৃথক থাকিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান-ধারণা করাই যে তাঁহার এই নির্জ্জন-নিবাসের প্রধান কারণ ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। তৎপরে তিনি পারস্য রাজ্যে গমন করেন। তথায় অবস্থিতিকালে মহর্ষি কয়েকখানি তত্ত্বোপদেশপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় এরূপ গভীর গবেষণা-প্রসূত যে, অনেকানেক জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতের বহুদর্শনকেও তাহাতে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতঃপর তিনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে বহুসংখ্যক যাত্রিক সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার পুণ্যক্ষেত্র মক্কায় আসিয়া উপনীত হন। এবার তিনি মক্কায় অধিক দিন অবস্থান করিতে পারেন নাই। কারণ এক জন নষ্টবুদ্ধি দুরন্ত লোক তাঁহাকে যাদুকর ভণ্ড যোগী

বলিয়া দুর্ণাম রটনা করে। তজ্জন্য তিনি ক্ষুণ্নমনে মক্কাতীর্থ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

তাপসরাজ সুদূরবর্ত্তী ভারতবর্ষে আসিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন, ভারতে নিরাকার একেশ্বরবাদ-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন,—অধিবাসীদিগকে সদুপদেশ প্রদানে সত্যপথে আনয়ন করিবেন। কিন্তু তাঁহার সেই আশা কত দূর ফলবতী হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করা যায় না। ফলতঃ এইরূপে তিনি বহু স্থানে গমন পূর্ব্বক লোকদিগকে বিবিধ প্রকারে সৎশিক্ষা প্রদান ও বহু সাধু-সহবাস করেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সকল স্থান হইতেই তাড়িত হইয়াছিলেন, কুত্রাপি সুনাম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ মহর্ষি যেরূপভাবে তত্ত্বকথা বলিতেন, অল্পবুদ্ধি লোকেরা তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অপবাদ রটনা করিত; এমন কি, অনেকে প্রকাশ্যে তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই; কিন্তু তাঁহার বীরহৃদয় অচল অটল,—দমিত হইবার নহে; তাহাতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও নিরুৎসাহিত বা ভগ্নোদ্যম হইতেন না, স্থিরমনে স্বীয় গন্তব্য পথের অনুসরণ করিতেন।

তপোধন বহু দিবস নানা দিগ্দেশ পর্য্যটন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। দীক্ষাভূমি বাগ্দাদে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মোন্মত্ততা চরম সীমায় সমুপস্থিত হয়। কথিত আছে, একদা তিনি স্বকীয় দীক্ষাগুরু তপস্বিকুল-ভূষণ খাজা সৈয়দ

জুনেদ শাহ্‌কে একটী প্রশ্ন করেন। সৈয়দ সাহেব তদুত্তরে বলেন, "মনসুর! সাবধান, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিও না, রসনা শাসনে রাখিও। নতুবা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, কোন্ দিন তুমি শূলাগ্রে আত্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বধ্যভূ'ম অনুরঞ্জিত করিবে।" প্রশ্নের উত্তরে এই কঠিন কথা শুনিয়া স্পষ্টবাদী নির্ভীক মনসুর খাজা জুনেদ শাহ্‌কে বলিলেন, "হাঁ, আমার সে শুভ দিন নিকটবর্ত্তী বটে; কিন্তু জানিবেন, তৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে আপনাকে সুফীর পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া শাহ্ জুনেদ নিস্তব্ধ ও নিরুত্তর। মনসুর ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলেন। ফলতঃ গুরু শিষ্য উভয়েরই এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। অতঃপর সে ঘটনা পাঠকগণের গোচরীভূত হইবে।

অনন্তর সাধকপ্রবর নির্জ্জনে যোগসাধনে উপবেশন করিলেন; আহার, বিহার, বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতি মানব-স্বভাব-সুলভ যাবতীয় ইন্দ্রিয়-সম্পর্কীয় কার্য্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন রহিলেন। কেবল সেই এক-ই ভাব—সেই ফল্গু নদীর অন্তঃপ্রবাহ—সেই বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা—সেই ধ্যানস্তিমিত নেত্র! সেই নীরব ও নিষ্পন্দতা! মশক-মক্ষিকাদির উপবেশনে দূরে থাক, দংশনেও গাত্র স্পন্দিত নহে। এই অবস্থায় দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন, দুই দিন করিয়া ক্রমে সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ, পক্ষের পর মাস, মাসের পর বৎসর, এইরূপে কত দিন, কত সপ্তাহ, কত পক্ষ, কত মাস, কত বৎসর

চলিয়া গিয়া অনন্ত কালের গভীর গর্ভে বিলয়প্রাপ্ত হইল, জগতের কত স্থানে কত পরিবর্ত্তন ঘটিল, কত মানবের ভাগ্য-চক্রের ঘূর্ণনে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল, কিন্তু মন্‌সুরের এই ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল না,—স্বভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ নিরন্তর নিরাময় নিখিলনাথের ধ্যান-ধারণায় নিবিষ্ট ;—সাধন-সমুদ্রের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হইয়া নির্জ্জীব জড়পিণ্ডের ন্যায় নিশ্চল রহিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে শত সহস্র আনন্দোৎসব, সুমধুর বাদ্যভাণ্ড বা কোন-রূপ ভীষণ অনিষ্টপাত হইলেও তদীয় চিরায়ত্ত চক্ষু-কর্ণ ভ্রমেও তদ্দিকে ধাবিত হইত না। ফলতঃ তিনি সংসার-আবল্য-জাল হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, মায়া-মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্য অন্তঃকরণে খোদার প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন। সে প্রেমের মর্ম্ম কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না! কিন্তু আগ্নেয়গিরির গহ্বরে অনলরাশি পরিপূর্ণ হইলে গিরি অগ্নি উদ্গীরণ না করিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারে ? পাত্র পূর্ণ হইলেই বারি স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আহা! এক দিবস ধর্ম্ম-প্রেমোন্মত্ত মন্‌সুর প্রেমের পূর্ণ আবেগে অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন,—"আনাল্ হক্" (অহং ব্রহ্ম বা আমিই খোদা)! উঃ কি ভীষণ অধর্ম্মের কথা! কি পাপের কথা! কি স্পর্দ্ধাজনক অন্যায় উক্তি!! রক্তমাংসময় নশ্বর মানবে—ইন্দ্রিয়ের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চালিত দুর্ব্বল মানবে, জল-বিম্ববৎ ক্ষণ-স্থায়ী ক্ষুদ্র মানবে ঈশ্বরত্বের অধিকার! গোস্পদে বিশাল

বারিনিধির আরোপ !! ইহা কি উন্মত্তের প্রলাপ নহে ? ভক্তের কি এই উক্তি ? কখনই নহে। সকলে ইহা শুনিয়া বিস্মিত ও চকিত হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায় নীরবে চাহিয়া রহিল।

এদিকে মুহূর্ত্তমধ্যে এই সংবাদ নগরময় প্রচারিত হইতে আর বাকী রহিল না। যে শুনে, সেই বিস্মিত, সেই স্তম্ভিত, সেই হতচৈতন্য। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। বাগ্দাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্ব সমাজেই এই একই কথা, একই বিষয়ের আন্দোলন ! কেহ কেহ, "হায় ধর্ম্মপ্রাণ মন্সুর পাগল হইয়াছেন !" বলিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। বন্ধু-বান্ধবও আত্মীয়গণ মন্সুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ভাই ! তোমার মনে এ বিকৃতি জন্মিল কেন ? তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ ? তুমি এক জন পরম জ্ঞানী; তোমাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমাদের অনধিকার-চর্চ্চা ও ধৃষ্টতামাত্র ! তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতেছি, "সাবধান, সাবধান ! জান তো, এ ধর্ম্মবিগর্হিত নিদারুণ পাপ কথা ! এ কথা পুনর্ব্বার উচ্চারিত হইলে তোমার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। এমন কি, ইহাতে তোমার জীবনের আশা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব স্থির হও, যাহাতে এই কুচিন্তা অন্তর হইতে বিদূরিত হয় এবং চিত্ত প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক ও সচেষ্ট হও। এ উক্তি তোমার পক্ষে, তোমার কেন, জগতের কোন লোকের পক্ষেই মঙ্গলজনক নহে। তাই পুনর্ব্বার বলিতেছি, তুমি আপনাকে জগতের শত্রু করিও না।

চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন কর।" ইত্যাকার কতই প্রবোধ প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উত্থিতফণ ফণী মন্ত্রৌষধ গ্রাহ্য করিল না। এ মন্ত্রে কোনও ফলোদয় হইল না, সকলই অসাধ্য ও ব্যর্থ হইল। প্রেমমুগ্ধ মন্‌সুর এ সান্ত্বনা-বাক্যে ভুলিলেন না। প্রবহমানা স্রোতস্বতীর দিগন্তগ্রাসী প্রবল প্রবাহ রোধ করে কাহার সাধ্য? তিনি নরলোক-দুর্লভ শান্তি-সুধাময় প্রেম-পারাবারের গভীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া আছেন, লোকের নিষেধ-বাক্যে সেই চিরসুখের স্থান কি পরিত্যাগ করিতে পারেন? সুখময় সরল পথ ছাড়িয়া কোন্ ব্যক্তি কণ্টকাকীর্ণ বক্র পথে পদার্পণ করে? ফলতঃ শত যত্নেও মন্‌সুরের মানসিক গতি আর ফিরিল না—সুহৃদ্বর্গের উপদেশ উপেক্ষিত হইল। তিনি উপহাসব্যঞ্জক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং গম্ভীরভাবে বলিলেন,—

"আনামান্ আহোয়া ওয়ামান্ আহোয়া আনা,
নাহ্‌নো রুহানে হালালনা বদানা।
ফা এজা আব্‌সারতানী আব্‌সারতাহু,
ওয়া এজা আব্‌সারতাহু আব্‌সারতানা।"

আমিই তিনি—যাঁহাকে আমি চাহি—আমি ভালবাসি এবং যাঁহাকে আমি চাহি—আমি ভালবাসি, তিনিই আমি। আমরা দুইটী আত্মা এক দেহে আছি। এই হেতু তুমি যখন আমাকে দেখ, তখন তাঁহাকে দেখিবে। ফলতঃ আমাকে দেখিলেই তোমাদের তাঁহাকে দেখা হইবে। তোমরা আমাকে জীবনের

ভয় দেখাইতেছ কি জন্য? আমার আবার জীবনের আশা কিসের? আমার কি জীবন আছে? আমি তো ইতিপূর্ব্বেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছি! আমি যে মৃত! মৃতের কি পার্থিব ভয় বা জ্বালা-যন্ত্রণা আছে? না কখন হইতে পারে? অথবা যদিই আমার জীবন থাকে, তবে তাহা তো অতি তুচ্ছ পদার্থ! যাহা এই আছে, পর মুহূর্ত্তে নাই, সে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের মূল্যই বা কত? সামান্য কাচখণ্ডের বিনিময়েও তো তাহা ক্রয় করিতে পারা যায় না। সেই অকিঞ্চিৎকর পদার্থের জন্য আবার ভয় কি? তাহার মমতা-যত্নই বা কি জন্য? ইহা বলিয়া ধর্ম্ম-মদমত্ত মন্‌সুর ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ "হক্ হক্ আনাল্ হক্" স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহর্ষি মন্‌সুরের ধর্ম্মোন্মত্ততার বিষয় পুস্তকান্তরে অন্যরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য সেই কৌতুকাবহ ঘটনাটীও এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

ইহা ভারতীয় মুসলমান সাধকবৃন্দের শিরোভূষণ ও তত্ত্ব-জ্ঞানের সমুজ্জ্বল সূর্য্যস্বরূপ মহিমার্ণব সিদ্ধ পুরুষ হজরত খাজা কুতব্‌উদ্দীন বক্তিয়ার কাকী সাহেবের কথা; সুতরাং বিশ্বস্ত, মূল্যবান্ ও সারগর্ভ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি একটী দরবেশ-বৈঠকে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্বের প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ প্রকাশ করেন যে, মহর্ষি হোসেন মন্‌সুরের একটী ধর্ম্মপরায়ণা জ্যেষ্ঠা সহোদরা ছিলেন। তিনি নির্জ্জনে অনন্যমনে যোগ-সাধনের নিমিত্ত নিত্য নিশীথ-সময়ে নগর-বহির্ভাগে এক নিবিড় অরণ্যে গমন করিতেন এবং যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিরাময় নিখিলনাথের ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হইতেন। ইহাই তাঁহার নিত্য তপস্যার নিয়ম ছিল। উপাসনান্তে যখন তাঁহার প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত হইত, তখন দৈব আজ্ঞায় নিয়োজিত একটী স্বর্গীয় দূত সুনির্ম্মল সুস্নিগ্ধ ঐশিক প্রেমামৃতপূর্ণ একটী সুদৃশ্য পানপাত্র হস্তে লইয়া তথায় শুভাগমন করিতেন এবং তাহা সেই পুণ্যবতী রমণীকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রদান করিতেন। রমণী হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক পাত্র গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লবদনে সেই দিব্য সুধা পান করত গৃহাভিমুখিনী হইতেন।

কি একটী ঘটনায় এই গোপনীয় ব্যাপারের আভাসমাত্র মন্‌সুর অবগত হইয়াছিলেন। প্রতিদিন নিশীথসময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া ভগিনী একাকিনী কোথায় গমন করেন? তপস্যার জন্য? অথবা অন্য কোন কারণে? এ রহস্য অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহার অন্তরে অতীব ঔৎসুক্য ও উদ্বেগ জন্মিল। তিনি স্বয়ং নিদ্রিত ভাণে জাগরিত থাকিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভগিনীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদা সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার ভগিনী নিয়মিত সময়ে সকলের অজ্ঞাতসারে যেই গাত্রোত্থান করিয়া নিস্তব্ধভাবে গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলেন, অমনি মন্‌সুরও গুপ্তভাবে নিঃশব্দ পদক্ষেপে অতি সন্তর্পণে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অগ্রে ভগিনী, পশ্চাতে ভ্রাতা,—উভয়ে নিশার নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া চলিতেছেন, কিন্তু ভ্রাতা ভগিনীর গোচরীভূত হইতেছেন না। ক্রমে নগরের শোভন উদ্যান ও অট্টালিকাশ্রেণী অতিক্রম করিয়া একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আসিয়া পড়িলেন। তথাপি গমনে বিরাম নাই—প্রান্তর পার হইয়া শেষে একটী নিবিড় অরণ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কুত্রাপি জনপ্রাণী নাই, প্রকৃতি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া শান্তিসুখে বিশ্রাম করিতেছেন। আকাশে আজ চন্দ্র নাই; কিন্তু লক্ষ লক্ষ তারকা প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় আপনাদের ক্ষীণ রজতরশ্মি বিতরণ করিয়া নৈশ তমিস্রের তরলতা সম্পাদন করিতেছে। এহেন সময়ে এই দুর্গম স্থানে সরলা কামিনী একাকিনী—এক

দিন নহে, প্রত্যহ একাকিনী আগমন করেন! কি ভয়ানক কথা! ইহা প্রকৃতই অবৈধ ও দুঃসাহসের কার্য্য। অন্তঃপুর-বাসিনী কোমলহৃদয়া কুলাঙ্গনার সৌম্য স্বভাবে একার্য্য কখনই শোভা পায় না। মন্‌সুর চিন্তাকুলচিত্তে ইহাই ভাবিতেছেন। তাঁহার ভগিনী কিন্তু স্বীয় কার্য্য সাধনে বিব্রত। তিনি বৃক্ষশ্রেণী-সমাকীর্ণ এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া অরণ্যের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ করিলেন এবং একটী বৃক্ষতলে লতাপল্লব-রচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

স্থানটী অতি মনোরম। চতুর্দ্দিকে ঘন সন্নিবেশিত তরুগুল্ম-রাজি প্রাকৃতিক প্রাচীররূপে বিরাজমান, মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ বিটপী ঘনপল্লববিশিষ্ট শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। বৃক্ষের নিম্নভাগ সমতল—সুন্দর—পরিষ্কৃত—পরিচ্ছন্ন! যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা ও স্বর্গীয় মাধুর্য্যে স্থানটী পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ ইহা সাধনার উপযুক্ত আশ্রম বটে। এখানে আসিয়া মন্‌সুরের ভক্তিনদী স্বতঃই উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি কৃতজ্ঞহৃদয়ে মহিমময় মহীশ্বরের উদ্দেশে মস্তক নত করিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিলেন। যে সন্দেহবশে তিনি ভগিনীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তিরোহিত হইল,—শ্রদ্ধা-পূতচিত্তে তখন ধর্ম্মশীলা ভগিনীকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার শেষ কার্য্যকলাপ দর্শনেচ্ছায় কিঞ্চিৎ দূরে লতাগুল্মের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

তপস্বিনী তপোমগ্না—বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা। তিনি বিশ্ব-বিধাতার ধ্যান-ধারণায় দেহ-প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছেন। নীরব—নিষ্পন্দ! প্রস্তর-প্রতিমার ন্যায় স্থির—যোগোপবিষ্টা। এ যোগ শত বজ্রপাতেও ভঙ্গ হইবার নহে। আহা কি অলৌকিক—কি অনির্ব্বচনীয় তপশ্চারণ! ধন্যা রমণী! ধন্য তাঁহার হৃদয়-বল!! মনসুর তখন বুঝিলেন, তাঁহার ভগিনী সামান্যা রমণী নহেন।

এই অবস্থায় যামিনীর যামত্রয় অলক্ষ্যে অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন রমণী কঠোর সাধন-সমাধি ভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। যেমন দণ্ডায়মান, অমনি সহসা কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল—বনভূমি আলোকচ্ছটায় ভাসিয়া গেল,—পরক্ষণেই এক শুভ্রকান্তি দেবদূতের আবির্ভাব! দূতবরের হস্তে পানপাত্র—উজ্জ্বল পানীয়পূর্ণ; তাহা হইতে স্বর্গীয় সৌরভ মনঃপ্রাণ মাতাইয়া বহির্গত হইতেছে। শুদ্ধচারিণী সুশীলা মহিলা অতি যত্নে পরমাগ্রহে পাত্র গ্রহণ করিলেন এবং ভক্তি-গদগদচিত্তে তাহাতে ওষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত করিয়া পান করিতে আরম্ভ করিলেন। কি সে সুধা, কে জানে? মনস্বী মনসুর অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত দেখিতেছেন; দেখিয়া বুঝিলেন—পাত্রস্থ পানীয় অপার্থিব, দৈব-প্রেরিত ও দৈবগুণসম্পন্ন, সন্দেহ নাই। যাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, অস্থি-মাংস-মজ্জা-রক্ত-গঠিত যে মানব ন্যায়-নিষ্ঠা-সদাচার-বলে বলীয়ান, স্বয়ং করুণাময় বিশ্বপতি যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, তিনিই এই পবিত্র স্বর্গামৃত পানের অধিকারী! তিনিই

ধন্য !! আহা পুণ্য-কর্ম্মফলে আমার ভাগ্যবতী ভগিনী যখন সেই অমৃত-ভাণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পান করিতেছেন এবং ভাগ্যক্রমে আমিও তাঁহার নিকট উপস্থিত আছি, তখন ঐ ভূলোক-দুর্লভ পরম পদার্থের অংশ গ্রহণ করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য। এ শুভ সুযোগ পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই উচিত নহে। ইহাই স্থির করিয়া মন্‌সুর ব্যস্ততা ও বিনয়ের সহিত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "ভগিনি ! ভগিনি !! ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, সমুদয় পান করিবেন না, আমাকে কিঞ্চিৎ প্রদান করুন।" ইহা বলিতে বলিতে তাঁহার দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন।

এ কি ! অকস্মাৎ এ কাহার কণ্ঠস্বর ! কে এ গভীর নিশাকালে এ নির্জ্জন বনপ্রদেশে আসিল ? রমণী চকিত ও বিস্মিত হইয়া পান-পাত্র হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভ্রাতা মন্‌সুর। মন্‌সুর ? কিরূপে কখন্ এখানে আসিল মন্‌সুর ? মন্‌সুর কেমনে এ সংবাদ জানিতে পারিল ? হায় হায়, তবে তো সে আমার গুপ্ত সাধনক্রিয়া সমস্তই জানিতে পারিয়াছে। সাধের ষড়যন্ত্র আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ! অহো অদৃষ্ট ! এত দিনে আমার সমুদয় পরিশ্রমই পণ্ড হইল !! পুণ্যময়ী রমণী অশ্রুপূর্ণ নয়নে এইরূপ অনু-শোচনার সহিত ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,— "মন্‌সুর ! মন্‌সুর আসিয়াছ ? উত্তম। পান করিবে ? কর ; কিন্তু ভাই ! এ পানীয়ের জ্বালাময় প্রভাব তোমার দুর্ব্বল ক্ষুদ্র প্রাণ সহ্য করিতে পারিবে কি ?" মন্‌সুর এ কথায় কর্ণপাত

করিলেন না—ব্যগ্রতার সহিত হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক পান-পাত্র গ্রহণ করিলেন এবং ভগিনীর পানাবশিষ্ট যে অতি সামান্য পানীয় ছিল, তাহাই ভক্তিভাবে ব্যস্ততার সহিত পান করিয়া ফেলিলেন। কি আশ্চর্য্য! পরক্ষণেই ভগিনীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। পান করিয়াই মন্‌সুর উদ্‌ভ্রান্ত—বিভোর—আত্মাহারা হইলেন, বিশ্বেশ্বরের মহিমা তাঁহার নয়নে বিভাসিত হইল; তিনি বিস্ফারিত লোচনে উর্দ্ধদিকে চাহিয়াই বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আনাল্ হক্, আনাল্ হক্, আনাল্ হক্"।

"চুপ—চুপ—চুপ! মন্‌সুর স্থির হও—থাম—থাম। তোমার কি হিতাহিত জ্ঞান নাই! ও কি কথা বলিতেছ? উহা আর মুখাগ্রে আনিও না। উহা অতি অন্যায় কথা!" কিন্তু হায়, শুনিবে কে? মন্‌সুর অজ্ঞান। তখন এ অনুযোগ-অনুরোধে কোন ফল হইল না দেখিয়া চারুশীলা তপস্বিনী বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় ব্যথিত হৃদয়ে হা-হুতাশ ছাড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে মন্‌সুরকে কহিলেন,—"রে অবোধ! রে ক্ষুদ্রপ্রাণ! আমি কি বলি নাই যে, এ পানীয় তেজোময়—ইহার প্রভাব তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। ফলতঃ তুমি কেবল আমার ধর্ম্মসাধনপথে কণ্টক স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইলে, তাহা নহে; আমার জীবনের মহান্ উদ্দেশ্যও নষ্ট করিলে। আরও আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুমি অতঃপর আত্মসম্মান নষ্ট করিবে, কলঙ্কিত হইবে এবং আমাকেও সেই কলঙ্কের অংশভাগিনী করিবে।" ইহা বলিয়া সেই তেজস্বিনী

রমণী চঞ্চলচরণে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দেবদূত ইত্যগ্রেই অদৃশ্য হইয়াছিলেন। মন্‌সুর উন্মত্ত! সেই অবস্থায় "আনাল্ হক্" উচ্চারণ করিতে করিতে প্রত্যূষসময়ে জনাকীর্ণ মহানগর বাগ্দাদে প্রবিষ্ট হইলেন।*

এক্ষণে একটী কথা। মহর্ষি মন্‌সুরের উন্মত্ততার পরিণাম-ফল পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষির ভগিনীর সহিত তাঁহার পরিণাম-ঘটনার দুই একটী বিষয়ের সংশ্রব আছে। কিন্তু তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করার আবশ্যকতা বিবেচিত হয় নাই। ফলতঃ সেই ঘটনা যে তদীয় ধর্ম্মশীলা ভগিনীর মাহাত্ম্য-প্রকাশক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তজ্জন্যই (অপ্রাসঙ্গিক হইলেও) এস্থলে সেই শেষের একটী ঘটনার কথা অগ্রে বলিতে বাধ্য হইলাম।

কথিত আছে, মহর্ষির দেহাবসানের অব্যবহিত পরে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিয়া কহেন, "মন্‌সুর এমনি তেজস্বী সাধু পুরুষ ছিলেন, যে, আপনি যাহা সত্য বলিয়া

---

* এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করুন, ঘটনাটী কি। এই রমণী যে বিশুদ্ধচরিত্রা ও ধর্ম্মানুরাগিণী, তাহাতে সংশয় নাই। ইনি নির্জ্জনে যোগ-সাধনোদ্দেশ্যে এই নিভৃত স্থানে নিত্য আসিতেন, তাহা তো আপনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এই শুভ্রকান্তি দেবদূত কে? আর তাঁহার হস্তস্থিত পানপাত্রই বা কি? জনৈক সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি বলেন, দেবদূত নামে বর্ণিত এই সাধু পুরুষ রমণীর দীক্ষাগুরু, তিনি অতি প্রাচীন ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তদীয় শ্বেত শ্মশ্রু ও শ্বেত কেশরাশিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন সুধাধবলিত সৌন্দর্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আর সেই পাত্র? তাহা তাঁহার অমৃতায়মান তত্ত্বজ্ঞান-ভাণ্ডার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অবধারণ করিয়াছিলেন, সহস্র পীড়ন সহিলেন, প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন, তথাপি তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তাঁহার ভগিনী এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত সদুঃখে বলিয়াছিলেন, "তোমরা নিতান্ত ভ্রান্ত! প্রকৃতই আমার ভ্রাতা যদি পুরুষ হইত, যদি তাহার কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা ও পৌরুষ থাকিত, তাহা হইলে পাত্র লেহন করিয়া কখনই উন্মত্ত হইত না—পূর্ণ পাত্র পানেও তাহার অন্তর অবিচলিত—স্থির—শান্ত থাকিত। আমি তাহাকে পুরুষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।" রমণী ইহা বলিয়া অতঃপর উত্তেজনার বশে বলিয়া ফেলিলেন, "আজ বিংশতি বর্ষ হইতে চলিল, আমি প্রত্যেক রজনীতে এই দৈব প্রেমামৃত পূর্ণ মাত্রায় পান করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কৈ, কখন মুহূর্ত্তের জন্যও তো বিচলিত হই নাই! আমার রসনা অবাধ্য হইয়া কখন তো অন্যয়াচারণ করে নাই!! বরং আমি নিয়ত নম্রতার সহিত প্রার্থনা করিয়াছি, "হে দয়াময় প্রভো! এতদপেক্ষা অধিকতর উন্নতিমার্গে আমাকে আকর্ষণ করুন।"

প্রিয় পাঠক! দেখুন কি তেজস্বিতা! কি অপূর্ব্ব নারী-হৃদয়ের বল! কি অলৌকিক সাধন-সহিষ্ণুতা! বলুন দেখি, ইনি কি মানবী?—না দেবী? কে না বলিবে, ইনি মানবী-আকারে মর্ত্ত্যধামে বরণীয়া দেবী ছিলেন। ফলতঃ তত্ত্বদর্শী প্রেমোন্মত্ত মন্‌সুর অপেক্ষাও যে এই নরকুল-গৌরব শুদ্ধমতী রমণীর তপশ্চারণ অতি নির্ম্মল ও উচ্চতর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মন্‌সুরের 'আনাল হক্' উক্তি ধর্ম্মভীরু মুসলমান জন-সাধারণের হৃদয়ে যেন সুতীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহারা সাতিশয় উত্ত্যক্ত ও মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। অনেকে নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে তাঁহার প্রাণসংহার করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অগৌণে মন্‌সুরের মস্তক অসি-প্রহারে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, ইহাই অনেক অসহিষ্ণু অবিবেচক ব্যক্তির অভিপ্রায়। আলেম-সমাজ* মন্‌সুরের অবৈধ আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া বিষম বিরক্তি-সহকারে বদনমণ্ডল বিকৃত পূর্ব্বক কর্ণে হস্তার্পণ করিলেন। কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতাশালী, ধৈর্য্যশীল, সিদ্ধপুরুষ মন্‌সুর তাহাতেও বিচলিত হইলেন না।

"হায় হায়, মন্‌সুরের কি হইল! আহা, কেন তাঁহার এ কুমতি ঘটিল?" এবংবিধ বাক্যে অগণ্য লোক অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। বহু দয়ার্দ্র ব্যক্তি সমবেত হইয়া মনসুরকে সানুনয়ে কহিলেন, "আপনাকে আমাদের একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। আপনি 'আনাল হক্' উক্তির পরিবর্ত্তে 'হু অল্ হক্' † বলিতে থাকুন। বোধ হয়, আমাদের এই অনুরোধের কারণ আর আপনাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আপনি স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞান-গরীয়ান্; অবশ্যই ইহার গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম

---

* ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতমণ্ডলী। † তিনিই সত্য (ঈশ্বর)।

করিয়াছেন।" মহর্ষি এতদ্‌শ্রবণে মৃদুগম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, সমুদয়ই বুঝিতে পারিয়াছি, আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু নহি, অনুপম দাতা ও দয়ালু আল্লার অসীম অনুগ্রহে বুঝিবার শক্তি আমার আছে। সত্য বটে, তিনিই সত্য, তিনিই ঈশ্বর—সমুদয়ই তিনি। তিনি সর্ব্বময়, তিনি বিশ্বব্যাপী, তিনি সর্ব্ব স্থানে সর্ব্ব সময়েই বিদ্যমান ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন।

নগর ভিতরে, বিজন কান্তারে,
জন-প্রাণী-হীন মরুভূ-মাঝারে,
উচ্চ গিরি-শিরে, নীল সিন্ধু-নীরে,
সুখদ আলোকে, দুখদ তিমিরে,
নরের অগম্য পর্ব্বত-গুহায়,
বজ্রাগ্নি-জড়িত জলদ-মালায়,
আকাশে পাতালে অনিলে অনলে,
সুদূর সুমেরু-কুমেরুমণ্ডলে,
গোলাপীঅধরা উষার ললাটে,
স্তিমিতনয়ন প্রদোষের পাটে,
ফল, ফুল, তরু, লতায়, পাতায়,
ফুলের সৌরভে, ফল-স্বাদুতায়,
অমৃতে গরলে, জলের কল্লোলে,
পাবক-শিখায়, পবন-হিল্লোলে,
সমুজ্জ্বল ছবি রবির প্রভায়,
চাঁদের কিরণে, রম্য তারকায়,

সংহার-মূরতি সমর-প্রাঙ্গণে,
কেলী-লীলা-ভূমি প্রমোদ কাননে,
সূক্ষ্ম বালুকণে, মানবের মনে,
দীনের কুটীরে, রাজার ভবনে,
তোমাতে, আমাতে, ধনী, বিত্তহীনে,
পতঙ্গ, কীটাণু, পশু-পক্ষী-মীনে,
আরো আছে যত নাম কব কত ?
সব তাতে তাঁর বিরাজ সতত !!

আহা ! তিনি সকল স্থানেই সকল সময়েই সমানভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! আমি তোমাদের কথায় বুঝিতেছি, তিনি যেন কোন্ সুদূর অপরিজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। আমরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তবুও তাঁহার দর্শন মিলিতেছে না, সে হারান ধনের—সে অমূল্য রত্নের উদ্দেশ পাইতেছি না। এ কি অদ্ভুত কথা তোমাদের ! কি অযৌক্তিক প্রলাপ-বচন ! কি ভয়ানক ভ্রান্তি !! চক্ষুষ্মান্ বিবেকী ব্যক্তি কখন কি একথা বলিতে পারে ? ভ্রাতৃগণ ! তিনি কি হারাইবার সামগ্রী ? দেখ দেখ ঐ দেখ, যদি নয়ন থাকে, তবে তাহা উন্মীলন করিয়া দেখ, অপরূপ বিরাটরূপে নয়ন-মন বিমোহিত করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে বিরাজিত রহিয়াছেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রাদির আধার যে অনন্ত আকাশ, তাহা কি ক্ষুদ্র নয়নের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতে পারে ? বিস্তীর্ণ মহাবারিধির লয় নাই, তাহা চিরদিনই সমভাবে

বর্ত্তমান। বরং ক্ষুদ্র আমি—সামান্য জল-বুদ্বুদমাত্র আমি, তন্মধ্যে পড়িয়া কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছি। আমার চিহ্ন বা সত্তার লেশমাত্র নাই। হায়, আমার আমিত্ব কোথায়?" ইহা বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। তখন অনুরোধকারী ব্যক্তি-গণের মনে আরও ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাঁহারা ইহার প্রতীকার প্রত্যাশায় উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ইস্‌লামের প্রকাশ্য-ক্রীয়াশীল সেই ব্যক্তিবৃন্দ ধর্ম্মোপদেষ্টা আলেমদিগের নিকটে গিয়া এই ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা তৎশ্রবণে সাতিশয় চমকিত হইয়া নানা প্রকার বাদানুবাদ ও অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তত্ত্বদর্শী সুফী-সমাজ নিস্তব্ধ—নীরব! তাঁহারা মনসুরের আভ্যন্তরিক অবস্থা এবং তাঁহার উক্তির গূঢ়ার্থ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তজ্জন্য তদ্বিরুদ্ধে বাক্যমাত্র ব্যয় করাও অন্যায় বোধে সকলেই মৌনাবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের সেই মৌনাবলম্বন-হেতু জন-সাধারণ মনসুরকে প্রকৃত ধর্ম্মবিরোধী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল। অনন্তর কি সাধারণ জনগণ, কি শাস্ত্রবিৎ আলেম-মণ্ডলী, সকলেই মনসুরের সেই মহাপরাধের দণ্ড প্রদানের জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধান ও মহামান্য খলিফার অনুজ্ঞা ব্যতীত তাহা সংসাধিত হইবার উপায় নাই। ইহা ভাবিয়া সকলে প্রথমতঃ মহামান্য মুফ্‌তীর (ফতোয়া-দাতার) অভিমতপ্রার্থী হইলেন। তৎকালে আবুয়ল আব্বাস্ নামক জনৈক শাস্ত্রজ্ঞান-গরীয়ান প্রতিভাবান্ পুরুষ বাগ্দাদের মুফ্‌তীর

পদে বিরাজিত ছিলেন। তিনি সমাগত ব্যক্তিবর্গের প্রশ্ন শ্রবণে প্রথমে নিরুত্তর হইলেন, তৎপরে পুনঃ প্রশ্নে মলিনমুখে কহিলেন, "মন্‌সুরের প্রকৃত চরিত্র আমার জ্ঞানের অতীত, সুতরাং তৎ-সম্বন্ধে কোন অভিমত ব্যক্ত করিতে অক্ষম।" ইহা শুনিয়া সকলে হতাশ-মলিন মুখে আসিয়া উজীরের শরণাপন্ন হইলেন।

খলিফার উজির হামিদ ইব্‌নে আল্ আব্বাস্ * ধর্ম্মভীরু ও অতি সরলচেতা ব্যক্তি ছিলেন। সমাগত জনমণ্ডলী মর্ম্মাহত হইয়া মন্‌সুরের ধর্ম্মবিগর্হিত উক্তি ও তজ্জনিত অনিষ্টের কথা করুণ কণ্ঠে বিবৃত করিলে তিনি আকুল উত্তেজনার সহিত মহর্ষির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং কহিলেন, "পবিত্র ইস্‌লামকে অক্ষুণ্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে এই ধর্ম্মদ্রোহীর শিরশ্ছেদন করাই কর্ত্তব্য।" কিন্তু আলেমগণ সেই ধর্ম্মোন্মত্তের বিরুদ্ধে পৃথক-ভাবে ফতোয়া দিতে অসম্মত, ইহা বুঝিয়া তিনি একটী সভা আহ্বান করিলেন। সভায় সাধারণ জনগণ এবং বাগ্দাদের যাবতীয় ধর্ম্মাচার্য্য সমবেত হইলেন, মন্‌সুরও আসিলেন। তাঁহার সহিত ঘোর তর্ক—অশেষ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বী মন্‌সুর কোনক্রমেই স্বীয় পথভ্রষ্ট হইবার পাত্র নহেন, তিনি আপন উক্তি প্রত্যাহার করিলেন না। তখন উজির ও সভাস্থ ব্যক্তিগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; ফতোয়া লিখিতে আদেশ হইল। বাগ্দাদ-ধর্ম্মাধিকরণের বিচারপতি কাজী ইব্‌নে

* পুস্তকান্তরে 'ইব্‌নে ফর়াত' লিখিত হইয়াছে।

ওমর কর্ত্তৃক মহর্ষির প্রাণদণ্ডের বিধি লিপিবদ্ধ হইল। অন্য ধর্ম্মাচার্য্যেরা তাহা অনুমোদন ও স্বাক্ষর করিলেন।

এই সময়ে মহর্ষি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "কাহার আজ্ঞায় কোন্ বিচারে আপনাদের এ অনধিকার চর্চ্চা? অথবা তাহা না হইলেও ছলনা করিয়া দোষ গ্রহণ কোন্ শাস্ত্রের বিধি? জানিবেন, আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান 'শরা'-সঙ্গত। * আমার ঈমান (ধর্ম্ম-বিশ্বাস) পবিত্র ইস্‌লামের পবিত্র ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্-তা'লার রচিত এই রম্য মন্দির ‡ চূর্ণ করে কাহার সাধ্য? সর্ব্ব-ব্যাপী শক্তিমান্ খোদা সর্ব্বত্রই স্বীয় রক্ষণশীল হস্ত বিস্তার করিয়া আছেন।"

মহর্ষির এবংবিধ অনর্গল বাক্যশ্রবণে উজির অতিশয় রুষ্ট ও বিরক্ত হইলেন এবং মন্‌সুরকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়া ফতোয়াখানি (ব্যবস্থা-লিপি) অবিলম্বে আমীরুল মুমেনীন মহামান্য খলিফার দরবারে উপস্থিত করিলেন। অনেক অসহিষ্ণু লোকও দরবারে গিয়া হাজির হইল।

তৎকালে মনস্বী জাফর আবুল ফজল আল্ মোক্‌তাদীর বিল্লাহ্ মহামান্য খলিফার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। তিনি এক জন কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র 'শরিয়ত'-বহির্ভূত* কোনও কার্য্য দেখিলে তিনি কাহাকেও

* শরা বা শরিয়ত—ইস্‌লাম-ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ কোর্‌আন শরীফ, হাদীস্ শরীফ্, এজ্‌মা এবং কেয়াস্।

‡ মন্দির—মহর্ষির দেহ।

মার্জ্জনা করিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরিয়া বিচার পূর্ব্বক দোষীর দণ্ডবিধান ও নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করিতেন। তিনি মন্‌সুরের অধর্ম্মোক্তির বিষয় অবগত হইয়া প্রথমতঃ 'পাপ—পাপ' বলিয়া ম্লানমুখে কর্ণকুহরে হস্তার্পণ করিলেন। পরে অধোবদনে নীরব হইয়া কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন—কাহাকেও কিছু বলিলেন না। এইরূপে বহু ক্ষণ অতীত হইল দেখিয়া আগন্তুকগণের মধ্যে এক ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "আমীরুল মুমেনীন! আপনাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া আমরা ভীত ও বিচলিত হইয়াছি। শাস্ত্রসঙ্গত শুভ কার্য্য পালনার্থ পাপ-প্রতীকারে নিশ্চেষ্ট থাকার কারণ তো কিছুই বুঝিতে পারি না! যদি পবিত্র ইস্‌লামকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, যদি ধর্ম্মাবমাননার প্রতিবিধান করিতে চান, পাপীর দমন যদি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। আপনি ধর্ম্মের রক্ষক এবং আমাদের প্রতিপালক, আপনি বৈধ ব্যাপারে শৈথিল্য বা অবহেলা প্রকাশ করিলে নির্ম্মল ইস্‌লাম-ধর্ম্মে কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষিপ্ত হইবে, 'তৌহীদে'র (একেশ্বরবাদের) গৌরবোন্নত মস্তক অবনত এবং আমাদের উজ্জ্বল মুখ মলিন হইবে। ক্ষুদ্র আমরা, ইহা ব্যতীত আপনাকে আমাদের আর কি অধিক বলিবার ক্ষমতা আছে, জাঁহাপনা?"

প্রজারঞ্জক খলিফা নীরবে সমস্তই শুনিলেন,—বুঝিলেন, তাঁহাদের মর্ম্মে কি অসহনীয় ভীষণ আঘাতই লাগিয়াছে।

পরন্তু সাধারণের অভিপ্রায় এবং মন্‌সুরের পরিণাম, এই উভয় দিক্ ভাবিয়া সেই আঘাতের প্রতিঘাত তিনি আপনিও অনুভব করিলেন। তাই তিনি স্থির-ধীর-নীরব-গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। কিন্তু কি করিবেন ? অবশেষে অনেক চিন্তার পর এই প্রকাশ্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে মন্‌সুরকে কারাগারে বন্দীভাবে রাখিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

এদিকে সত্যাকৃষ্ট মন্‌সুর যখন রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন, তখন চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল। জনসঙ্ঘ মহর্ষির অগ্রপশ্চাৎ কি যেন এক মহোৎসবে মত্ত হইয়া ছুটিল। তপোধন অবিলম্বে ভীষণ কারাভবনের দ্বারদেশে নীত হইলেন। নির্দ্দয় রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে কারারক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিল—মন্‌সুর বন্দী হইলেন। আহা কি আক্ষেপ ! কি ঘোর যাতনা !! জনসঙ্ঘ আবার তখনই কোলহল করিতে করিতে ফিরিল ; বাগ্দাদের ঘরে ঘরে আনন্দ-স্রোত বহিল, আবালবৃদ্ধ-বনিতার মুখে এই কথাই চলিল। মন্‌সুরের দুঃখে কেহ হৃষ্ট, কেহ রুষ্ট, কেহ বা সমবেদনায় নীরবে অশ্রুমোচনে নিরত হইল।

জনৈক গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থমধ্যে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, যখন মহর্ষি ধৃত ও প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া কারা-দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি অবজ্ঞার সহিত উপহাস করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মন্‌সুরকে কহে, "ওহে সুফি ! তুমি যদি সাধনার বলে প্রকৃতই সিদ্ধপুরুষ হইয়া থাক, তবে

আজ তোমার এ ভয়ানক দুর্গতি দেখিতেছি কেন ? তোমার সেই তপোবল কি এই সামান্য সৈন্য-বলের নিকট পরাভূত হইল ? দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল-সংগ্রামে ভীরুপ্রকৃতি অজের জয় ! এ অতি আশ্চর্য্য ও বিড়ম্বনা দেখিতেছি। হায় ভণ্ড যোগি ! যদি তুমি বাস্তবিকই সাধক হইতে, যদি তোমার অণুমাত্রও সাধনার বল থাকিত, তাহা হইলে শত সহস্র বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আজ এই কষ্টকর বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে অবলীলাক্রমে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতে। অহো ! যে অদূরদর্শী ব্যক্তি ছলনার ছদ্মবেশে দেহাবৃত করিয়া—ধর্ম্মের ভাণ করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করে এবং তদ্ধেতু পরিশেষে আপনি ঘোর বিপদে পতিত হয়, এ জগতে তাহার অপেক্ষা অধিক অর্ব্বাচীন আর কে আছে ?”

মহর্ষির কর্ণে এই বিদ্রূপসূচক কটূক্তি সুতীক্ষ্ণ শেলের ন্যায় প্রবেশ করিল। মূর্খের কর্কশ বাক্যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করা অনুচিত জানিলেও তিনি কেবল তাহাকে অপ্রতিভ করণার্থ তাহার বিদ্রূপ-বাণী শ্রবণমাত্র সেই সশস্ত্র রাজপ্রহরীবেষ্টন ও নাগরিকগণের জনতার মধ্যস্থলে থাকিয়া শত-সহস্র সতর্ক নেত্রে ধাঁধা লাগাইয়া সহসা কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, তাহা কেহ অনুভব করিতেই পারিল না। তখন রাজকিঙ্করগণ ও জন-সাধারণ সকলেই বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত, বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া নীরবে পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মুখে শব্দ নাই, নয়নে পলক নাই, হৃদয়ে শোণিত অচল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পন্দন-রহিত—শক্তিশূন্য—স্থির। নাট্যশালার পট-

পরিবর্ত্তনের ন্যায় সহসা কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল। ভাবিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কূটবুদ্ধি প্রহরিগণও এ ব্যাপারে ম্রিয়মাণ—সংজ্ঞাহারা। পরে তাহাদের চৈতন্যোদয় হইলে, "হায় কি হইল, কোথায় গেল, কোথায় গেলে মন্‌সুরকে পাইব, খলিফা শুনিলে কি বলিবেন, তাঁহার সম্মুখে কি উত্তর করিব, হায়, না জানি কি কঠোর শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে! এত লোকের হস্ত হইতে পলায়ন! ছি ছি! কি লজ্জার কথা, কি অপমানের বিষয়! কি করিয়া রাজ-দরবারে এ পোড়া মুখ দেখাইব? দেশদেশান্তরের লোক এ কথা শুনিলেই বা কি বলিবে! হায় হায়, এমন বিপদে কেহ তো কখন পড়ে নাই!" ইত্যাকার অনুতাপ-বাক্যে মহা হুলস্থূল বাধাইয়া দিল। কেহ কিঞ্চিৎ মৌখিক সাহস দেখাইয়া কহিল, "ওরে ভাই! ভাবিয়া কি হইবে; আর ভয়ই বা কিসের? আমরা তো আর মন্‌সুরকে সাধ করিয়া ছাড়িয়া দিই নাই! সে যে একটা ভয়ানক যাদুগীর, সকলেই জানিয়াছে সে মায়াবী! মায়া-বিদ্যার বলে যাহার 'গায়েব' (অদৃশ্য) হইবার শক্তি আছে, তাহাকে আমরা কেন? জগতের সমস্ত রাজশক্তি একত্র হইলেও শাসনে রাখিতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সকলে চল, খলিফার দরবারে গিয়া এ কথা জানাই। আর তিনিই কি ইহা অবগত নহেন?" অনেকের কিন্তু এই সাহসের বাক্যে মন আকৃষ্ট হইল না; তাহারা হতাশমলিনমুখে মস্তকে হাত দিয়া অবশাঙ্গে বসিয়া পড়িল, খুঁজিয়া কূল-কিনারা পাইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
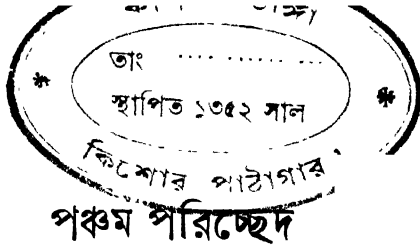
বন্দী পলায়ন করিয়াছেন। প্রহরিগণ ব্যস্ততার সহিত দিগে দিগে অনুসন্ধানে ফিরিতেছে, নগরময় মহা আন্দোলন-কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু কিরূপে কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। যাহাদের তত্ত্বাবধানে বন্দী যাইতেছিলেন, তাহারাও "এই ছিল, এই নাই" ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারে না। আপন আপন বুদ্ধির প্রাখর্য্যানুসারে কত জন কত কথার অবতারণা করিতেছে, কত কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। এদিকে সাধকশ্রেষ্ঠ মন্সুর দৈবশক্তি প্রভাবে অদৃশ্য হইয়া স্ব-ভবনে আসিয়া উপস্থিত। তিনি পূর্ব্ব নিয়মানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া নিরাপদে নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানকারী জনগণ কেহই তাহার দর্শন পাইত না। কিন্তু তিনি কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির প্রতি সদয় হইয়া সাক্ষাৎ করিতেন ও তাহাকে প্রীতিসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময়ে দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি যে বস্তু তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেন, তিনি তাহাই পাইতেন। সে বস্তু দুষ্প্রাপ্যই হউক, আর সুলভ-লভ্যই হউক, প্রার্থনামাত্র তপোধন হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক 'এই ধর' বলিয়া তপোবলে সেই দ্রব্য প্রদানে যাচকের সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন, তাহাতে অনুমাত্রও বিলম্ব বা অগ্রপশ্চাৎ

বিবেচনা করিতেন না। আবার কখন তিনি লোকলোচনের গোচরে আসিয়া স্বেচ্ছায় ধৃত হইয়া কারাগৃহে নীত হইতেন; কিন্তু আবার পরক্ষণেই যোগবলে তথা হইতে অদৃশ্য হইয়া নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিতেন। এইরূপে তিনি ঐন্দ্রজালিকের মায়াবিদ্যার ন্যায় নানা অত্যদ্ভুত কার্য্য দ্বারা সকলকে বিস্ময়াভিভূত করিতে লাগিলেন। সাধারণে তাঁহার এই প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়াও ঈর্ষাবশতঃ তাঁহার অপযশঃ ব্যতীত প্রশংসা কীর্ত্তন করিল না। এই অবস্থায় অনেক দিন অতীত হইয়া গেল। মনসুরের সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে নিত্য নূতন নূতন বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খেরা মনসুর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবেই আছেন, ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করিল। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহাতে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন।

একদা মহর্ষি বন্দী অবস্থায় কারাবাসের অভ্যন্তরে দেখেন, অসংখ্য বন্দী সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহার অন্তরে আঘাত লাগিল। তিনি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদের সেই ভীষণ কষ্টের উপশম করিতে চিন্তান্বিত হইলেন। অবশেষে যখন দিবাগতে রাত্রি উপস্থিত হইল, তখন তিনি প্রত্যেকের কারাবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্দীবৃন্দ আপন আপন দুর্দ্দশার পূর্ব্ব ঘটনা বর্ণনা করিলে পর তপস্বিপ্রবর কহিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আমি তোমাদিগকে এই মুহূর্ত্তেই এই অসহ্য কারাযন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রদান

করিতেছি। তোমরা আমার কথা শুন, এই নরকতুল্য অগম্য স্থান হইতে আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান কর, ইহাতে আর কালবিলম্ব করিও না।" তখন বন্দিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর-স্বরে কহিল, "হজরত! আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হইবে? আমরা কি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মুখ দেখিয়া ইহ-জীবনে আবার আনন্দলাভ করিতে পারিব? আমাদের স্বাধীনতা যে নিশার স্বপ্নবৎ অলীক। এই দেখুন, আমাদের হস্ত-পদ লৌহ-শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করি বা এক পদ অগ্রসর হই, আমাদের এরূপ শক্তি নাই। সুতরাং ইহজীবনে আমাদের আর পরিত্রাণের আশা কোথায় আছে, বলুন দেখি? অহো! সে আশা যে সুদূরপরাহত! তবে যদি আপনার আশীর্ব্বাদে এই মন্দভাগ্যের প্রতি দৈব কখন অনুকূল হন, তাহা হইলে একথা এক দিন সম্ভব হইলেও হইতে পারে। নতুবা আকাশের চন্দ্র ধারণের ন্যায়, পঙ্গুর পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের ন্যায় নিষ্ফল কল্পনা করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে আরও যন্ত্রণাদায়ক ও বিপজ্জনক বলিয়া জানিবেন।"

বন্দীদিগের এই কাতর বাক্য শুনিয়া দয়ালহৃদয় মন্সুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনি তাহাদের উদ্দেশে ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধদিকে হস্তোত্তোলন করিয়া সজোরে নিম্ন দিকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। আহা কি আশ্চর্য্য তপোবল! কি অপার্থিব সাধন-শক্তি!! মহর্ষির পবিত্র হস্ত নিম্ন মুখে যেই আকৃষ্ট হইল, অমনি কয়েদীদিগের হস্ত-পদ-নিবদ্ধ শৃঙ্খলনিচয় খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে ভূতলে নিপতিত হইল। বন্দি-

গণ হস্ত-পদের বন্ধন-বিমুক্ত ও নরক-যন্ত্রণার অবসান হইল দেখিয়া সোৎসাহে উঠিয়া মহর্ষির সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং সহর্ষে যুক্ত-করে কহিল, "মহাভাগ! করুণাময় জগৎপাতার ইচ্ছায় এবং আপনার ঐকান্তিক যত্ন ও আশীর্ব্বাদে সংপ্রতি আমরা বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু বলুন, কি উপায়ে এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন ভীষণ কারাপুরী হইতে প্রস্থান করি? অত্যুচ্চ নগরাজ সদৃশ দুর্ভেদ্য উন্নত প্রাচীরে কারা-ভবন পরিবেষ্টিত, যমদূতাকৃতি অসংখ্য ভীষণদর্শন সশস্ত্র প্রহরী দিবারজনী তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, লৌহবিনির্ম্মিত দৃঢ় কবাট কঠিন কুলিশোপম তালাসমূহে আবদ্ধ। এতদ্ব্যতীত আরও বহুবিধ অন্তরায় রহিয়াছে। পিপীলিকা প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ পথও এখানে নাই, তবে বলুন তো, আপনার এ মন্দ-ভাগ্য ভৃত্যগণের কি এমন দৈবশক্তি আছে যে, তৎপ্রভাবে তাহারা নিরাপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিতে পারে?"

এই খেদোক্তি শ্রবণে তাপসপ্রবর স্বীয় গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া এবং তর্জ্জনী ঊর্দ্ধে উঠাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চতুঃপার্শ্বে নেত্রপাত করিলেন। তাহাতে মহর্ষির দৈবশক্তিবলে কারাবাসের চতুর্দ্দিকস্থ বিশাল ভিত্তিতে মানব-দেহ প্রবেশোপ-যোগী বহু গবাক্ষের সৃষ্টি হইল। * তদ্দর্শনে বন্দিগণের হৃদয় বিস্ময়-রসে আপ্লুত, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইল—ভাবিয়া

* বর্ত্তমানের নব্য সমাজ এরূপ ঘটনা বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারেন বটে, কিন্তু অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। মনুষ্য যোগবলে—সাধন-শক্তিতে অলৌকিক

আকাশ-পাতাল কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অতঃপর তাহারা তপস্বীর ইঙ্গিত-ক্রমে সেই সদ্যসৃষ্ট গবাক্ষদ্বার দিয়া অলক্ষ্যে বহির্গত হইয়া পড়িল, প্রহরিগণ তাহার অণুমাত্রও অনুভব করিতে সমর্থ হইল না।

পর দিবস নিশাবসানে কারারক্ষকগণ বন্দীদিগের তত্ত্ব লইতে গিয়া দেখে, বন্দীশালায় একটীও বন্দী নাই। তখন সকলেই চমকিত, চিন্তিত ও ভয়াকুল হইল। ক্রমে এই বিস্ময়জনক ঘটনা রাজপুরুষগণের কর্ণে উঠিল। কারাধ্যক্ষ অবিলম্বে কারাগার পরিদর্শনে আসিলেন, দেখিলেন কারাগৃহ শূন্য—নিস্তব্ধ; কারাবাসীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। দেখিতে পাইলেন, কেবল মহাযোগী হোসেন মনসুর ধ্যানস্তিমিত নেত্রে গম্ভীরভাবে এক প্রান্তে উপবিষ্ট আছেন। আর দেখিলেন, কারা-প্রাচীরে অসংখ্য গবাক্ষ-দ্বার। এই অদ্ভুত কাণ্ড দর্শনে কারাধ্যক্ষ নিরতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। যুগপৎ হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময় ও ভয় তাঁহার অন্তরাত্মাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল,—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। ক্ষণেক স্থিরদৃষ্টে এক দিকে চাহিয়া কি চিন্তা

ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কি না করিতে পারেন? অমূক সাধু দীর্ঘকাল মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত ছিলেন, অমূক সন্ন্যাসী শূন্যপথে প্রয়াণ ও নদীর উপর দিয়া গমন করিয়াছিলেন, এ সকল একেবারে ভিত্তিশূন্য কথা নহে। পৃথিবীর সর্ব্ব জাতির সাহিত্য-ইতিহাসে এবংবিধ ঘটনার উল্লেখ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক দিনের কথা নহে, রাজা রণজিৎ সিংহ এক জন সন্ন্যাসীকে মৃত্তিকা-মধ্যে ৪০ দিন প্রোথিত রাখিয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পাঠকগণ সেই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ঘটনার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন।

করিলেন। আহা, কি অলৌকিক ক্ষমতা! কি অমানুষিক চমৎকার কার্য্য !! এই অশ্রুত ও অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার তপস্বীকুল-শিরোভূষণ মহাত্মা মনসুর কর্ত্তৃক সমাহিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত জানিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিস্ময়সহ ভক্তির উদ্রেক হইল। আবার এক জন পুণ্যপ্রাণ সাধুপুরুষকে নিকৃষ্টকর্ম্মা দুর্জ্জনদিগের সহিত একত্রে কারাবদ্ধ করা হইয়াছে, সুতরাং পরিণামে তন্নিমিত্ত ভক্ত-বৎসল বিশ্ববিধাতার সমীপে না জানি কত অপরাধী ও দণ্ডার্হ হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া নিমেষ-মধ্যে বিষাদের কৃষ্ণ আবরণে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল,—প্রফুল্ল মুখমণ্ডল মলিন মূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ অপলকনেত্রে ললাট কুঞ্চিত করিয়া নীরব রহিলেন।

অতঃপর নিরীহ কারাধ্যক্ষ ধীর পদবিক্ষেপে মহর্ষির নিকটবর্ত্তী হইয়া অবনতমস্তকে অভিবাদন পূর্ব্বক হস্তপদে চুম্বন প্রদান ও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বিনয়নম্রবচনে শত শত সাধু-বাদ প্রদান করিয়া গদগদকণ্ঠে কহিলেন,—"হজরত! আমরা রাজাজ্ঞানুসারে আপনার প্রতি যাদৃশ উৎপীড়ন করিয়াছি, তাহাতে আপনার সম্মুখে বাক্যব্যয় করিতে আর সাহস হয় না। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে—আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুলভাবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে অগ্রসর হইতেছি। এ দীন রাজ-কিঙ্কর, এই বন্দীশালার তত্ত্বাবধান-কার্য্য এই দীনের উপর ন্যস্ত আছে। বন্দী-সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা ঘটিলে আমাকে বিপন্ন হইতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে যেরূপ ঘোর

সঙ্কট উপস্থিত, তাহাতে আমার জীবন সংশয় নিশ্চিত, ভাবিয়া আমি আকুল ও আত্মহারা হইয়াছি। সাধু-প্রবর! কেবল আপনার এই দীন-হীন দাসের তুচ্ছ জীবন গেলে দুঃখ ছিল না, বরং তাহাতে পাপী-তাপী যে আমি, আমি আপনাকে সুখী ও কৃতার্থ বোধ করিতাম। কেননা এক জন সৎকর্ম্মশীল পবিত্র পুরুষের কৃত কার্য্য যদি অন্য হীন জনের জীবন নাশের কারণ হয়, তবে তাহা কম সৌভাগ্য ও পুণ্যের কথা নহে। কিন্তু যেরূপ সর্ব্বনাশকর মহান্ অনর্থ আজ সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আমি বুঝিতেছি,—আমার নিজের, আমার অধীন কর্ম্মচারিগণের এবং আমার পুত্রকলত্রাদির পর্য্যন্ত প্রাণনাশের সম্ভাবনা। তাই আমি ভীতচিত্তে এবং বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই যে শমনপুরী সদৃশ প্রহরী-বেষ্টিত ভীষণ কারা-ভবন, যাহার নাম শ্রবণে জগৎ আতঙ্কিত হইয়া থাকে, যাহাতে ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকারও প্রবেশ বা নিষ্ক্রমণের পথ নাই, বিশ্বব্যাপী সমীরণ এবং রবি-রশ্মিও যেখানে সঞ্চরণ করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে হেন কঠিন স্থান হইতে অপরাধীবৃন্দ কিরূপে কখন কোথায় পলায়ন করিল? অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা বলিয়া এ দীন দাসের উদ্বিগ্ন চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন।”

তেজস্বী তাপস কারাধ্যক্ষের বাক্য শ্রবণে গম্ভীরভাবে কহিলেন, “জানিও, আল্লাহ্-তা’লার অনুগ্রহ হইলে পার্থিব নিগ্রহের অবসান হইয়া থাকে। বন্দীরা আজ বিধাতার অনুগ্রহেই মুক্তিলাভ করিয়াছে।” মহর্ষি ইহা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন কারাধ্যক্ষ কহিলেন, "তবে আপনি আর এস্থলে বসিয়া নিরর্থক কষ্টভোগ করিতেছেন কেন? আপনি তো সর্ব্বাগ্রেই এই কুস্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারিতেন? আমি বিনীত-ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আপনিও স্বভবনে প্রত্যাগমন করুন। নিয়তি-লিপি খণ্ডনীয় নহে, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। রাজপুরুষগণ এই অত্যদ্ভুত ঘটনার কারণজিজ্ঞাসু হইলে—আমার উপর উৎপীড়ন হইলে আমি যদৃচ্ছা উত্তর প্রদান করিব।"

কারাধ্যক্ষের কাতরোক্তি শ্রবণে মহর্ষি কহিলেন, "কারা-বাসিগণ খলিফার বন্দী, অল্প দোষী, তাই তাহারা মুক্তি লাভ করিয়াছে। আর আমি আল্লার বন্দী—ভীষণ অপরাধী, আমার মুক্তি নাই। আমি কোথায় যাইব? যে ব্যক্তি আল্লার কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, ইহজগতে তাহার কি পলাইবার স্থান আছে? অথবা পলাইলেও কি তাহার রক্ষা হইতে পারে? আমার দেহ-তরী বিস্তীর্ণ জলধি-বক্ষ-ভাসমান অসহায় তৃণখণ্ডের ন্যায় অনন্ত পাথারে ভাসাইয়া দিয়াছি। অনন্ত অপার অসীম বারিরাশি আমার চতুর্দ্দিকে বিশাল মরুস্থলীর ন্যায় ধূ-ধূ ধূ-ধূ করিতেছে, উত্তাল তরঙ্গাঘাতে নিমেষে শতবার নিমজ্জিত এবং শতবার উত্থিত হইতেছি; আমার সৈকতভূমি-সংলগ্ন হইবার আশা সুদূর-পরাহত। আমি দিশাহারা হইয়া কুল-কিনারা খুঁজিয়া পাইতেছি না। সুতরাং এখান হইতে যাইব কোথায়? যাইতে আমার প্রবৃত্তি নাই। রাজদণ্ডে আর ভয় করিয়া কি করিব?

আমি হৃদয় দৃঢ় করিয়াছি। আমার দৈহিক পরমাণু অন্য পরমাণুতে যাইয়া বিলয়প্রাপ্ত হউক, 'মন্সুর' এ হেয় এ অকিঞ্চিৎকর নাম পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ বা অনুতাপ নাই। আহা, মৃত্যুকে তো আমি কুশলকামী পরম বন্ধু বলিয়া মনে করি, তীক্ষ্ণাগ্র শূলাস্ত্র তো আমার সুখস্থান-প্রবেশের সুখময় প্রশস্ত সোপান! আহা, কবে সে সুখ-সোপানে আরোহণ করিব? কবে সে আনন্দের দিন আসিবে? কিন্তু সুখের দিন সহজে আসিতে চায় না, সুখ সহজে ঘটে না, ইহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। কারাপতে! তুমি এখন যাও, এস্থান হইতে প্রস্থান কর। আমার প্রিয় কার্য্যের—আমার প্রিয়জনের কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইও না; অমি এখানে থাকিতে অসন্তুষ্ট নহি।"

বুদ্ধিমান জেলরক্ষক মন্সুরের সারগর্ভ বাক্যের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎক্ষণাৎ কারাগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তখন মহর্ষি নির্জ্জনে উপযুক্ত সময় পাইয়া একাগ্রচিত্তে যথারীতি 'অজু' অর্থাৎ শাস্ত্র-বিধিসঙ্গত হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক অঙ্গশুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পরে কায়মনোবাক্যে পরম করুণাময় আল্লাহ্-তা'লার উদ্দেশে মস্তক নত করিয়া নমাজে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার ভক্তির উৎস উচ্ছ্বসিত হইল। তিনি পবিত্র খোদা-প্রেমে বিভোর হইয়া একেবারে স্পন্দনশক্তিরহিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উপাসনা সাঙ্গ হইলে তন্ময়চিত্তে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া

গদগদকণ্ঠে 'মনাজাত' (প্রার্থনা) কারলেন,—"জগৎপতে! হে মহিমময় ভুবনপালক! হে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী অনাদি পুরুষ! তোমার অপার অনন্ত কৃপা-পারাবারের এক বিন্দু বারি বিতরণে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। তুমিই একমাত্র দয়াময় দাতা—রহ্মান ও রহীম, তোমার দান অতুলনীয়। তুমিই এই অখিল সংসারে ও প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে দয়ার্দ্র—পূর্ণ প্রেমময়, তুমিই বিশ্বরাজ্যের একমাত্র রাজরাজেশ্বর সার্ব্বভৌম সম্রাট্। তোমার রাজ্যে—তোমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে, এমন কেহই কোন কালে বিদ্যমান ছিল না ও নাই; তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, উচ্চ-নীচ, সৎ-অসৎ, দরিদ্র-ধনবান্, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই অন্তরের ভাব তুমি অবগত আছ; তোমার সকাশে সকলই বিশদ ব্যক্ত,—অণুমাত্র লুক্কায়িত নাই। জগৎ, জগতের স্থাবর জঙ্গম পদার্থনিচয়, স্বর্গ-নরক তোমারই সৃষ্ট। তুমিই নিঃসন্দেহ সর্ব্বনিয়ন্তা, স্রষ্টা এবং পাতা। তোমার চিরস্থায়ী চির-কল্যাণকর সুন্দর নিয়মে, তোমার অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি-পরি-শোভিত এই ভূমণ্ডলে যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত পরি-চালিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য তোমার চিরন্তন প্রভুত্বশক্তি! কি সুদৃঢ় শাসন-বন্ধন!! তোমার আজ্ঞা ব্যতীত ক্ষুদ্র একটী তৃণ-খণ্ডেরও হেলিবার দুলিবার সাধ্য নাই! প্রেমময়! তুমিই আমাকে উন্মত্ত করিয়াছ। আমি তোমারই প্রেমে উন্মত্ত! প্রেমিকের অশান্ত প্রাণের প্রফুল্লতা দিতে তুমিই তো সমর্থ।

তুমি দয়াময়—শান্তিদাতা—স্নেহপ্রবণ-হৃদয়। ব্যথিতের যন্ত্রণা বুঝিতে, পীড়িতের রোগ-প্রতীকার করিতে, তুমি বিনা আর কে আছে? আমি পীড়িত—অশান্ত, তোমার সম্মিলনের অমোঘ ঔষধ প্রদানে আমার চিরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ কর! তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় আমি ম্রিয়মাণ, আমার হৃদয় জর্জ্জরিত, প্রাণ অবসন্ন। আর বিলম্ব সহ্য হয় না; আশা পূর্ণ কর প্রভো! অহো! এ পাপ-নয়নে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি, মনঃপ্রাণ দুর্ব্বিষহ যাতনায় হু-হু করিয়া জ্বলিতেছে, হৃদয়ে কে যেন ঘোর বিষবাণ নিয়ত বিদ্ধ করিতেছে। প্রভো! আমার কিরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে, তোমার তো তাহা অবিদিত নাই। তুমি তো সমস্তই দেখিতেছ জীবননাথ! দেখ, আজ তোমার দাস কিনা উন্মত্ত—পাগল! মনসুর পাগল! তাই কারাগৃহে বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু সখে! পরম সুখে আছি। সুগন্ধামোদিত কুসুমোদ্যান অথবা বিবিধ চিত্ত-চমৎকারী বিলাস-সাজ-সজ্জায় সজ্জিত সুন্দর প্রাসাদ, ইহার তুলনায় অতি হেয়—অতি তুচ্ছ। কেননা তোমার জন্যই তো আমার এই অবস্থা। ইহা তোমারি নামের মহিমা-দ্যোতক। সখে! আমি তোমারই প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তোমারই সম্মিলনপ্রার্থী। তোমারই বিচ্ছেদানল আমার অন্তরে দিবানিশি ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; মিলনের স্নিগ্ধ সুখদ বারিপাতে শীঘ্র সেই তীব্র অগ্নি নির্ব্বাণ কর। হে মালেক! আর যে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারি না। তোমার এই দর্শনোন্মত্তের প্রতি সদয় হও, ক্ষুধার্ত্ত

পতঙ্গের মিলন-দীপ্তিতে তৃপ্তি সাধন কর—অধমকে তোমার প্রেমিক বলিয়া গ্রহণ কর। হো হো হো! এ আবার কি? এ আবার কি খেলা! মিলন হইতে হইতে আবার নিবৃত্তি! কৌশলি! এ আবার তোমার কি কৌশল? না—আর না। ও খেলা রাখ—তোমার ও আমার মধ্য হইতে পার্থক্যের পর্দ্দা উঠাইয়া লও, আকাশ-পাতাল এক হইয়া যাউক—আমার আমিত্বটুকু তোমাতেই বিলীন হউক! তোমার সঙ্গ লাভ করিয়া তোমার পথে থাকিয়া প্রেমে মজিয়া জগৎ বিরুদ্ধ হয়—হউক, তোমার প্রদত্ত এ ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার নামে উৎসর্গ করিতে—ধূলিময় এ অসার দেহকে শূলাগ্রে সমর্পণ করিতে আমি তিলমাত্র কুণ্ঠিত নহি, বরং সে কার্য্য সমধিক আনন্দের, সমধিক গৌরবের বলিয়া আমি বিবেচনা করি। অতএব হে মালেক! হে সন্তাপিতের শান্তিদাতা! হে বাঞ্ছাকল্পতরু! আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।”

তপোধন এই প্রকারে উপাসনা সাঙ্গ করিলেন। কথিত আছে, এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রার্থনাকালে করুণ-কাতরে অনু-শোচনা করিতে দেখিয়া বিদ্বেষ-বুদ্ধি বশতঃ অবজ্ঞাভাবে বিকৃত-স্বরে কহে, “দরবেশ! আজ আপনাকে রক্তমাংসময় মরণশীল মানবের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছি। বিধাতার অখণ্ডনীয় লিপি-নিয়মাধীন মন্দমতি মানব আমরা আল্লাহ্-তা'লার আরাধনা করিতে অবশ্যই বাধ্য। কিন্তু আপনি যখন স্বয়ং ‘আনাল্ হক্’ বলিয়া ঐশিক দাবী করিতে-

ছেন, তখন বলুন তো, আপনি আবার কোন্ খোদার উদ্দেশে মস্তক নত করিয়া নমাজ নির্ব্বাহ করিলেন? যে ব্যক্তি স্বয়ং অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বশক্তিধর অনাদি পুরুষ, তাঁহার কি কখন পুরুষান্তরের স্তবস্তুতির আবশ্যক হয়? না তাঁহার কেহ উপাস্য থাকিতে পারে?"

উন্মত্ত মন্‌সুর ইহা শ্রবণে গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ভদ্র! তোমার এ প্রশ্ন বিবেচনামূলক বটে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া অসূয়াপরিশূন্য হৃদয়ে কহিলে এ প্রশ্ন সমধিক আনন্দ-বর্দ্ধক ও প্রীতিকর হইত। কিন্তু সে অপরাধ তোমার নহে। মরণধর্ম্মশীল অচিরদেহী অহঙ্কৃত মানবমাত্রই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া মোহবশে মূলমন্ত্র বিস্মৃত হইয়া অঙ্গীকৃত সুব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া ফেলে এবং অশুভপ্রদ অপকর্ম্মকে পরম কল্যাণকর কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। ফলে এক্ষণে হৃদয়কে সরল পথে চালাও, আমার বাক্য প্রণিধান কর। আমি নিজেরই উপাসনা—নিজেরই স্তবস্তুতি নিজে করিয়া থাকি। আমার 'নমাজে' আমারই প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। আমি নিজেই উপাস্য—নিজেই উপাসক, নিজে শিষ্য—নিজে গুরু, নিজে অনুসন্ধানকারী—নিজেই অনুসন্ধেয় বস্তু, নিজে প্রেমিক—নিজেই প্রেমাস্পদ, নিজে চাকচিক্যশালী ক্ষুদ্র বালু-কণা—নিজেই বিরাটবপু পর্ব্বত, নিজে কিরণকণিকা—নিজেই অনমুমেয় প্রকাণ্ড জ্যোতিঃ-পদার্থ, নিজে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তম। আমি স্বয়ং অপার অনন্ত মহাসমুদ্র,

আবার স্বয়ং তন্মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র এক জলবিম্ব। অক্ষয় অবিনশ্বর সমুদ্র-গর্ভ হইতেই বিম্বের উৎপত্তি এবং তাহাতেই তাহার স্থিতি। সুতরাং সমুদ্র ও জলবিম্বে কি পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে? কখনই নহে। এ উভয় পদার্থ কেহ কখন কাহারও সঙ্গ পরিত্যাগ করে না। একের বিয়োগে, একের অভাবে দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অম্বুবিম্ব ক্ষণভঙ্গুর, অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী; উহা পরিণামে প্রেম-ভরে ভগ্ন হইয়া সেই মহাসাগরে বিলীন হইয়া যায়। শেষে যখন সে আপনার অস্তিত্ব লোপ করিয়া সাগরে মিলিত হইয়া থাকে, তখন আবার ওটী সাগর এটী তদুৎপন্ন বিম্ব, এরূপ পার্থক্য প্রদর্শন করিবার কারণ কি আছে? মুগ্ধ! চক্ষুর সদ্ব্যবহার কর, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় স্থানে যাবতীয় পদার্থে সেই অচিন্ত্যশক্তি বিশ্ব-প্রকাশক সর্ব্বগুণৈকনিলয় পরমপুরুষ মহিমা-গৌরবে সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুতে তাঁহার সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নিহিত থাকিয়া জগতের আনন্দ-বিধান করিতেছে। যাহার অন্তর হইতে অন্ধকারাবরণ অন্তরিত হইয়াছে—ব্যবধান তিরোহিত হইয়াছে—জ্ঞানাঞ্জন সহযোগে যাহার নয়ন-পঙ্কজ বিশদভাবে বিকশিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে তদীয় বিশ্ব-বসুধা-ব্যাপ্ত বিরাট্ একত্ব দেখিয়া-শুনিয়া তাঁহাকে কোন্ ধারণায় কোন্ মুখে দ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? কি প্রকারে 'তুমি আমি'

বলিয়া বিভিন্ন ভাবিতে পারে? আহা কি আক্ষেপ!" ইহা বলিয়া আধ্যাত্মিক সাধক মনসুর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ 'আনাল্ হক্' 'আনাল্ হক্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একদা নিশীথকালে মহামনস্বী হোসেন মন্‌সুর গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শয়ান ছিলেন এবং তদবস্থায় স্বপ্নযোগে এক কল্পনাতীত অপূর্ব্ব ঘটনা নয়নগোচর করেন। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, যেন এক বিস্তীর্ণ শুভ্র ভূমিখণ্ডের উপর একটী প্রকাণ্ড বস্ত্রাবাস স্থাপিত রহিয়াছে। বস্ত্রাবাসটীর শোভা-সৌন্দর্য্য অতি মনোরম—বর্ণনাতীত। আহা, শিল্পিপ্রবর তদীয় অত্যাশ্চর্য্য অকৃত্রিম শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় প্রদানার্থ যেন তাহা অপরূপ বিশ্বোজ্জ্বলকারী সুস্নিগ্ধ জ্যোতিরাশি দ্বারা পরম যত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বস্ত্রাবাসটীর চতুর্দ্দিক্ হইতে বিজলীপ্রভাগঞ্জন ঔজ্জ্বল্যলহরী বিনির্গত হইয়া দিগ্‌দিগন্তর আলোকিত ও আমোদিত করিতেছে। বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরস্থ সাজ-সজ্জাসমূহের সৌন্দর্য্যই বা কত! তৎসমুদয় অত্যদ্ভুত, অলৌকিক ও অতি মনোহর। মানবের রসনা তাহার বর্ণনা করিতে অশক্ত। মানবের ভাষাও সেরূপ ভাবপ্রকাশক শব্দসমষ্টির কাঙ্গাল। নর-চক্ষু সে সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার অণুমাত্রও শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ফলতঃ সে সমুদয় সজ্জা মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ও অতুলনীয় বটে, কিন্তু সর্ব্বোপরি সেই বস্ত্রাবাসের মধ্যস্থ মৃদু-মন্দ-মলয়-মারুত-শীতলীকৃত ছায়ার গুরুত্ব-গরিমা ও মর্য্যাদা অধিক। কেননা নিদারুণ নিদাঘের প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপ-প্রতপ্ত ক্লিষ্ট জনগণ সেই সুশীতল ছায়াতলে

আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহাদের শরীরের তাপ ও হৃদয়স্থিত কলুষরাশি বিদূরিত হইয়া যায় এবং সুবিমল সত্বগুণের সঞ্চরণে তাহারা নিঃসন্দেহে ইহ-পারলৌকিক সুখশান্তি ও সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে।

বস্ত্রাবাসের মধ্যস্থলে মরকত-বিখচিত কমনীয়কনকাসনোপরি জগজ্জন-হিতৈষী, মানবের একমাত্র পরিত্রাণপথ-প্রদর্শনকারী মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা প্রসন্ন বদনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট আছেন, দেখিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য সৌম্য মূর্ত্তির জ্যোতিতে সর্ব্ব স্থান উজ্জ্বল হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে এবং সেই সুকুমার স্বর্গীয় শরীরের সৌগন্ধে দশ দিক্ প্রমোদিত করিয়াছে। হজরতের চতুষ্পার্শ্বে পবিত্র ইস্‌লামের গৌরব-মুকুট-স্বরূপ ধর্ম্মপ্রাণ দরবেশ ও শহীদবৃন্দ যথাযোগ্য আসনে নতভাবে আসীন রহিয়াছেন। সভার শোভা অতি রমণীয়, যেন সুবিমল নভোমণ্ডলে সংখ্যাতীত কাঞ্চনকান্তি নক্ষত্রের সমাবেশ, মধ্যস্থলে অকলঙ্ক শশধর ভুবনমোহনরূপে বিরাজ করিতেছেন।

সভাস্থল নীরব, সভাসদ্‌বর্গ নিস্তব্ধ। সহসা বস্ত্রাবাসের এক স্থানে একটী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পরিলক্ষিত হইল। সেই ছিদ্রপথ-মধ্য দিয়া সূর্য্যের কিরণ আপতিত হইতে দেখিয়া সমাগত সাধকবৃন্দের সাতিশয় উৎকণ্ঠার আবির্ভাব হইল। কেননা তদ্দ্বারা তাঁহারা ক্লেশানুভব করিতেছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা প্রত্যেকেই সেই ছিদ্র রুদ্ধ করণার্থ প্রাণপণ শক্তিতে

বহু প্রকারে চেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অশেষবিধ যত্ন ও বহু পরিশ্রম করিয়াও সেই সাধন-বল-গরীয়ান্ মুক্তাত্মগণের কেহই সফল-মনোরথ হইতে পারিলেন না। আহা যে ধর্ম্ম-পন্থা-চির-বিচরণশীল কৃতী পুরুষগণ দৈবশক্তি প্রসাদে কত কত অসম্ভব ও অদ্ভুত কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিয়াছেন, কত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, আজ তাঁহারা এই কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান-ভাবে নতশিরে অবস্থান করিয়া রহিলেন। ছিদ্র-পথ কোনমতেই রুদ্ধ হইল না, সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া জগৎ-গুরু পুণ্যপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সকলকে অতি করুণ মৃদুস্বরে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"হে ইস্‌লাম-হিত-কামী মহামতিগণ! তোমরা বৃথা চেষ্টা ও বৃথা পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইতেছ কেন? তোমাদের প্রয়াস, তোমাদের যত্ন ফলপ্রদ হইবে না। আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, যে পর্য্যন্ত না হোসেন মনসুর আপন ইচ্ছায় স্বীয় মস্তক ছিদ্র-পথ-তলে অর্পণ করিবেন, তদবধি উহা কোনক্রমেই অবরুদ্ধ হইবার নহে।"

সেই গরীয়ান্ দেব-সভায় স্বয়ং মন্‌সুরও একটী আসন পরিগ্রহ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি নিখিলনাথ-বান্ধব নরকুলহিতৈষী হজরতের প্রমুখাৎ এবংবিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে সোৎসাহে তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আহা কি অনুগ্রহ! আহা কি স্নেহ-বাৎসল্য!! আহা কি আমার সৌভাগ্য!! প্রভো!

এক মস্তক কেন? আজ যদি এই দীনাতিদীন দাসের লক্ষ মস্তক থাকিত, তাহা হইলে প্রভুর নির্দ্দেশ-মত এই দণ্ডেই জগৎ-প্রীতি-জনন সেই বিশ্ববিভুর কার্য্যে সাদরে উৎসর্গ করিয়া এ দাস কৃতার্থ ও ধন্য হইত। হায়! এই বসুন্ধরাতলে এমন সম্মানিত সৌভাগ্যবান্ পুরুষ কে আছে, যে ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যু-রক্ষণ-ভূত আল্লার পথে আত্মজীবনোৎসর্গ করিয়া পারলৌকিক শ্রেয়ঃ লাভ সহ তদীয় প্রিয় হইতে পারে? যদি প্রণয়ীর জন্য প্রাণ যায়, যদি প্রিয়ভাজন বান্ধবের বিপদে বিপন্ন হইয়া আত্মবিনাশ ঘটে, তবে তাহা অপেক্ষা শুভাদৃষ্ট ও সুখের বিষয় এ জগতে আর কি আছে? প্রেম করার নাম আত্মবলিদান, ইহা আমি বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। যে প্রেমিক আত্ম-বলিদানে অসমর্থ, যে প্রেমিক প্রেম-সঙ্কটে মস্তক ছেদিত হইবে বলিয়া বিচলিত ও ভয়-বিহ্বল, সে কখন প্রেমিক নহে, প্রেম কিরূপে করিতে হয়, সে জানে না;—সে ভণ্ড, সে শঠ, সে ছদ্মবেশী ধূর্ত্ত!" জগদ্‌গুরু হজরত মোহাম্মদ মহামতি মন্‌সুরের এইরূপ সদুত্তর শুনিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে তাঁহার অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক ঐশিক প্রেমিকতার ভূরি ভূরি যশোকীর্ত্তন করিলেন।*

অকস্মাৎ মন্‌সুরের নিদ্রাভঙ্গ হইল, জড়তা কাটিল; সঙ্গে সঙ্গে দেব-সভাও নয়নের ব্যবধানে পড়িয়া গেল। তিনি

* ঋষিবরের এই স্বপ্নবৃত্তান্তের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা কোন কোন মহাত্মা এইরূপ করিয়াছেন। স্বপ্নদৃষ্ট বস্ত্রাবাসটী জগৎস্রষ্টার প্রিয় ও পরম পবিত্র বাহ্য ইস্‌লাম ধর্ম্মস্বরূপ

জাগরিত হইয়া সে স্বর্গীয় শোভা-সমৃদ্ধি—সে সভ্যগণ-সমাবেশাদির আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু সেই সুর-সভা ও তাহার সভ্যবৃন্দের ক্রিয়াকলাপ তদীয় হৃদয়-ফলকে প্রতিফলিত হওয়ায় এবং মানস-যন্ত্রে প্রতিঘাত করায়, তিনি তখনও যেন তৎসমুদয়ের জীবন্ত বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। পরন্তু সচৈতন্য ব্যক্তির এ মোহ—এ মরীচিকাময় ভাব আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? তিনি ক্ষণকাল পরেই শয়নকক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হা-হুতাশ ছাড়িয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দরদরধারে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন?—হাত নাই। অবশেষে হতাশ-মলিন-মুখে প্রেম-গদগদ ভাষে পুনর্ব্বার তিনি "হক্—হক্, আনাল হক্" বলিয়া উচ্চধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

(শরিয়ত)। প্রধান স্তম্ভ পয়গম্বরপ্রধান হজরত স্বয়ং, তিনি অন্যান্য ধার্ম্মিকগণের সহিত উহা মস্তকে ধারণ করিয়া যত্নে রক্ষা করিতেছেন। সূর্য্যোত্তাপে তপ্ত (অর্থাৎ ধর্ম্মভ্রান্ত) নরগণ ইহার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইলে অর্থাৎ শান্তিপ্রদ সনাতন ইস্লাম-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে অন্তিমে পরিত্রাণ পাইয়া পরম সুখের অধিকারী হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-বিগর্হিত উক্তি 'আনাল হক্' মন্সুর কর্ত্তৃক উচ্চারিত হওয়ায় বস্ত্রাবাসের (ইস্লাম-ধর্ম্মের) এক স্থানে ছিদ্রস্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। ঐ ছিদ্র অবরোধার্থ অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়া অর্থাৎ মন্সুরকে 'আনাল হক্' বলিতে নিষেধ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। সেই জন্য কথিত হইয়াছে যে, যদবধি হোসেন মন্সুর স্ব-ইচ্ছায় ছিদ্রপথে স্বীয় শিরস্থাপন না করিবেন অর্থাৎ 'শরিয়ত'-নিষিদ্ধ 'আনাল হক্' উচ্চারণে ক্ষান্ত না হইবেন, অথবা আত্ম-বিসর্জ্জন না করিবেন, তদবধি উহা অপরের সহস্র চেষ্টায় কিছুতেই রুদ্ধ (তিনি উহা উচ্চারণে কিছুতেই নিবৃত্ত) হইবার নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মনস্থরের অহম্-ব্রহ্মবাদিত্বের কথা দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইতে আর বাকী নাই। কিন্তু আজ তিনি ধৃত ও বন্দী—প্রশান্তভাবে কারাগৃহে অবস্থান করিতেছেন। এই সংবাদ শ্রবণে চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র সহস্র লোক দলে দলে আসিয়া কারাগৃহ-সমীপে সমবেত হইতে লাগিল। বিশাল বাগ্দাদ নগরস্থ ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা আলেমগণও সেই স্থানে আসিতে ত্রুটি করিলেন না। ফলতঃ কি সংসার-জ্ঞানশূন্য তরলবুদ্ধি বালক, কি কৌতূহলাক্রান্ত বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ, কি স্থিরবুদ্ধি বৃদ্ধ, কি পথশ্রান্ত পথিক, সকলকেই কোন-না-কোন প্রকার প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র হইয়া এই জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। সকলেই কোপ-পরায়ণ, সকলেরই মনস্থরের প্রতি রোষকষায়িত দৃষ্টি। কত জনে কত কথা বলিতেছে; কোলাহলের গম্ভীর ধ্বনি তাল বাঁধিয়া আকাশে গম্ গম্ করিয়া উঠিতেছে। পরিশেষে কতকগুলি লোক বহু প্রকার তীব্রোক্তি করিয়া মনস্থরের জীবননাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। সেই স্থানে মহর্ষির সহাধ্যায়ী বন্ধু শেখ আবুবকর শিব্লীও সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রিয় বন্ধুর আসন্ন বিপদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিরতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন। তখন তিনি বাগ্দাদের সর্ব্ব-লোক-মান্য মহাতাপস সৈয়দ জুনেদ শাহের নিকটে আসিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে সমুদয় নিবেদন করিতে আর ক্ষণ-বিলম্ব করিলেন না।

জ্ঞানবৃদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য জুনেদ শাহ্ এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন—তাঁহার মুখকান্তি সহসা রূপান্তরিত হইল। অতঃপর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি সাধন-কুটীর হইতে বাহির হইলেন এবং কতিপয় প্রবীণ লোকের সহিত শশব্যস্তে কারাগৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, সংখ্যাতীত লোকের সমাগম হইয়াছে। কি ভয়ানক বিরাট্ ব্যাপার! সকলের উত্তেজনা ও অভিপ্রায় দেখিয়া-শুনিয়া তিনি ভীত হইলেন; কি যে বলিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক ধীরগম্ভীরে কহিলেন, —"হে ইস্লামের ধর্ম্মভীরু প্রিয় সন্তানগণ! হে সমাজের শান্তিকামী সুধীবর্গ! আপনারা আজ ধর্ম্মের জন্য—ধর্ম্মাবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। ইহা আপনাদের ধর্ম্মনিষ্ঠার জ্বলন্ত উদাহরণ, —সমাজের জীবন্ত শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী কথা—বিশেষরূপ বিবেচনা না করিয়া কোন গুরুতর কার্য্যে উৎসাহিত ও অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। আমি ভরসা করি, আল্লার অনুগ্রহে আপনারা আমার বাক্যে বিরক্ত না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন। দেখুন, এই মনসুর অবোধ নহে; ধর্ম্ম-কর্ম্মে তাহার যথেষ্ট আস্থা ও অচলা ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইস্লাম-সম্মত নমাজ ও অন্য ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে তাহার কিছুমাত্র ক্রটি পরিলক্ষিত হয় না। তবে মাত্র একটী

কথার নিমিত্ত আজ আপনারা তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন —হইবারই কথা। যেহেতু প্রদীপ্ত হুতাশন-সন্তাপে পদার্থমাত্রই উত্তপ্ত হইয়া থাকে। আবার যদি সেই অগ্নি নিস্তেজ হয় বা একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তবে তাবৎ বস্তুই শীতল ও শান্তভাব অবলম্বন করিতে দেখা যায়। তাই বলিতেছি, মন্‌সুর যদি ইস্‌লামের বিরুদ্ধ বাক্য উচ্চারণে চিরবিরত থাকে, তবে কি সে ক্ষমার পাত্র নহে ? দোষ মনুষ্যেই করিয়া থাকে, ক্ষমাও মনুষ্যহৃদয়ের এক অদ্বিতীয় মধুর গুণ! যিনি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্-তা'লার নিকটে তাঁহার যথেষ্ট পুরস্কার আছে। তাই বলিতেছি,—আপনারা অবশ্যই শান্ত ভাব অবলম্বনে তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন—তাহার প্রতি দয়া করিবেন। আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তাহার মুখ হইতে 'শরিয়ৎ'-বহির্ভূত নিষিদ্ধ বাক্য আর কদাপি বহির্গত হইবে না।"

এই কথা বলিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ জুনেদ শাহ্ মন্‌সুরের নিকট গমন করিলেন এবং প্রীতিপূর্ণ বচনে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন,— —"এ কি মন্‌সুর! সহসা তোমার এমন চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল কেন ? কোন্ ঘটনায় তোমার রসনাকে এরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ নিন্দিত বাক্য-স্ফুরণে বাধ্য করিয়াছে ? স্থিরভাবে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বল।" তখন উন্মত্ত মন্‌সুর "আমার এক মুহূর্ত্তেরও অবসর নাই, আমাকে একটু অবসর দিউন!" ইহাই বলিয়া প্রসন্নভাবে অন্য দিকে বদন ফিরাইলেন। তদ্দর্শনে সৈয়দ সাহেব কথঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া

গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"মনস্থর! তুমি এ বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ কর, ভয়ানক পাপ কথা আর মুখাগ্রে আনিও না, প্রকৃতিস্থ হও। তোমার শ্রবণকটু পাপময় বাক্যে—তোমার বৃথাভিমানে জগৎ সন্তুষ্ট নহে। যে দাবী মানবকুলে কেহ কখন করে নাই,—করিতে পারে না, যে কথা কর্ণেও কেহ শুনে নাই, মোস্‌লেম-জগৎ যাহাতে মহাপাপ অর্শে বলিয়া জ্ঞান করে, এক জন কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খও যে কথা শুনিলে সঙ্কুচিত ও ভয়বিহ্বল হয়, আজ তুমি এক জন ক্ষণভঙ্গুর মৃত্যুর অধীন ক্ষুদ্রশক্তি মানব হইয়া তাহা উচ্চারণ করিলে এবং তদ্দ্বারা 'শরিয়তে'র অবমাননা করিলে মোস্‌লেম-সমাজ কোনক্রমে সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। আমি তোমার ধর্ম্মগুরু ও মঙ্গলার্থী। তোমার অমঙ্গল ঘটিলে আমার যাদৃশ কষ্ট অনুভব হইবে, তেমন আর কাহারও হইবে না। অতএব স্থির হও, আমার কথা শ্রবণ কর, সুনির্ম্মল সনাতন ইস্‌লামের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিও না—বিঘ্ন ঘটাইও না। অন্যথা তোমার খোদা-প্রেম, তোমার ভজনা-সাধনা কোন ফলোপধায়ক হইবে না, তুমি পরিশ্রমের পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, শিক্ষা-দীক্ষার অসহ্য গুরু ভারে তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি জন্মিয়াছে। দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় প্রকৃত পথ হইতে তুমি অপসারিত হইয়াছ—তোমার স্পৃহনীয় লক্ষ্য পথ-ভ্রষ্ট হইয়াছে, জলভ্রমে তরঙ্গায়িত মরীচিকার দিকে ধাবিত হইতেছ। এখনও বলিতেছি, যদি কল্যাণ কামনা কর, সরল এবং সুপথে আইস। ইহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ যে,

আল্লাহ্ অতি মহান্, সর্ব্বশক্তির আধার, অক্ষয়, অদৃশ্য ও জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার সদৃশ কেহ বা কিছুই নাই। তাঁহার দান বা সৃষ্ট পদার্থ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, তৃণ, বায়ু, সিন্ধু, সরিৎ, মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্র, গিরি, নদী, বন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, শূন্য, দিবা, রজনী, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা প্রভৃতি। তবে বল দেখি, এমন মহিমময় মহাশক্তির দাবী করা—তৎসদৃশ হইতে যাওয়া কি পাগলের প্রলাপ নহে? রক্তমাংস-অস্থি-মজ্জা-গঠিত অচিরদেহধারী মনুষ্যের পক্ষে কি ইহা কোনক্রমে শোভা পায়? আর যদি তোমার উক্তি যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়ানুমোদিত হইত, তাহা হইলে নরের অনন্যশরণ রসুলে-করিম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা 'শেরেকী' অর্থাৎ খোদা-তা'লার অংশী-স্থাপন করা বা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে তত্তুল্য জ্ঞান করা মহাপাপ বলিয়া কদাচ নিষেধ করিয়া যাইতেন না। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ পয়গম্বরগণের অগ্রগণ্য মহাপ্রাণ পুরুষ,—সংখ্যাতীত নক্ষত্রের মধ্যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃপূর্ণ অকলঙ্ক শশধরস্বরূপ। আহা! যে পূর্ণ চন্দ্রের নির্ম্মল আলোকে অখিল বিশ্ব আলোকপ্রাপ্ত, পবিত্র কোর্‌আনের বিধি এবং তাঁহার আজ্ঞা অবহেলন করা যে কত দূর অন্যায় ও দূষণীয় কার্য্য, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না? তাই পুনঃ বলিতেছি,—স্নেহভাজন! যদি বুদ্ধিমান্ হও, অবিলম্বে এই পথ পরিত্যাগ কর; হজরত নূরনবীর পথানুসরণ করিয়া আত্মকল্যাণে রত থাক।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মত্ত মন্‌সুর উন্নতশীর্ষে চক্ষু-

রুন্মীলন পূর্ব্বক বিরক্তি সহকারে স্বীয় দীক্ষাগুরু সৈয়দ জুনেদ শাহ্‌কে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "আপনি আমার মোরশেদ—জ্ঞান-চক্ষুদাতা, সুতরাং নতমস্তকে আপনাকে অভিবাদন করি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে আমি কুণ্ঠা বোধ করিব না। আপনি কেন আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? আপনার বচন-পরম্পরায় স্পষ্টই আমার প্রতীতি হইতেছে যে, প্রেমের মাহাত্ম্য এখনও আপনি বুঝিতে সমর্থ হন নাই, ইহার সুমধুর রসাস্বাদনে আপনি বঞ্চিত আছেন। যদি প্রেমতত্ত্বে আপনার অণুমাত্রও অধিকার থাকিত, তাহা হইলে আজ আমার প্রতি কঠিন কুলিশোপম বাক্যবাণ বর্ষণে উদ্যত হইতেন না। আর বলুন তো, পয়গম্বরশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সম্বন্ধে আপনি কি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন? তাঁহার ইঙ্গিতের প্রকৃত উদ্দেশ্য বোধ করা সাতিশয় কঠিন ব্যাপার। তিনি বলিয়াছেন, "বিশ্ব-পাতা খোদা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছেন।" এবং ধর্ম্মগ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে, "আমি (সৃষ্টিকর্ত্তা) মনুষ্যের নিকট হইতেও অতি নিকটে আছি।" এক্ষণে বলুন দেখি, আপনি ইহার কিরূপ মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনি প্রকাশ্য ধর্ম্মকর্ম্মে, বাহ্য অনুষ্ঠানে, লৌকিক আচার-ব্যবহারে বিশেষরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বলুন দেখি, চাকচিক্যময় বহির্ভাগ দেখিয়া ভিতরের ভাব কি হৃদয়ঙ্গম করা যায়? কখনই নহে। তাই বলিতেছি, কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানে কিছুই হইবে না, অন্তর ও বাহির নির্ম্মল এবং একই কেন্দ্রাভিমুখী করা চাই। যেমন কোন

পাত্রের ভিতর ও বহির্ভাগ সম্যক্ পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত হইলে স্বতঃই উহা দর্শকের ভক্তি ও শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শাস্ত্রোক্ত 'জাহের' ও 'বাতেন'—প্রকাশ্য ও গুপ্ত ('শরিয়ৎ' ও 'মারফত') উভয়বিধ ধ্যান-ধারণার সমতা রক্ষা করিতে পারিলে সেই বিশ্বকল্পতরু মহিমময় রব্বেল আলামিন স্বয়ং প্রসন্নচিত্তে ভক্তকে অমৃতরসাভিষিক্ত মধুর ফল প্রদান করিবেন, নতুবা নহে। তুলাদণ্ডের এক দিক্ ভারাক্রান্ত করিলে দণ্ড কোন্ কালে সমভাবে সরল পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? আহা! পবিত্রতম খোদার কালাম কোর্আন শরীফে যে অভিপ্রায় স্পষ্ট পরিব্যক্ত রহিয়াছে, আপনার হৃদয়ক্ষেত্রে তাহার ছায়ার লেশ-মাত্র নিপতিত হয় নাই। তবে আপনি কেমন করিয়া আল্লার রসুলের প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিলেন? স্বাদ গ্রহণ না করিলে কোন বস্তু মিষ্ট, তিক্ত বা কষায়, তাহা বলিতে পারা যায় কি? ফলতঃ নিজে ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে অক্ষম হইয়া অপরকে প্রকাশ্যে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট বলিয়া অপবাদ দেওয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। বৃথা বাদানুবাদে কোনও সুফল সমুদ্ভূত হয় না। কি জন্য আমি ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইলাম, বিশেষরূপে বিবেচনাপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে আপনি তাহার শাস্ত্রসঙ্গত উত্তর প্রদান করুন। আমি যাহা করি, তাহাই উৎকৃষ্ট, তাহাই খোদা-তা'লার অনু-মোদিত, তাহাই যুক্তিযুক্ত কার্য্য, এরূপ বোধ করা কদাচ সমীচীন নহে—ভ্রান্তমতি স্বল্পধী মানবের পক্ষে সঙ্গত নহে। আপনার পথটী সরল কি বক্র, অগ্রে তাহার অবধারণ করা

কর্ত্তব্য। কে না জানে, এ সংসারে সত্য কণ্টকময় ও বিপজ্জনক! কে না জানে, সে পথে নানা প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইয়া থাকে। হায়! আজ আমাকে ন্যায়ের অনুরোধে আবার বলিতে হইল যে, সে পথের পথিক হইতে আপনি অসমর্থ; তাহাতে অনেক সৌভাগ্য, অনেক সহিষ্ণুতা, অনেক সম্বলের প্রয়োজন। আপনার সে সম্বল কৈ? খোদা-তা'লার প্রকৃত একত্ব ও মহত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানের অধিকার আপনার কোথায়? আপনার অন্তরে প্রণয়ের ভীষণ প্রতিবন্ধক-স্বরূপ লক্ষাধিক সুদৃঢ় পর্দ্দা প্রলম্বিত, সুতরাং সেই প্রেমময় নিখিলনাথের নির্ম্মল প্রেম লাভ করিয়া অপার্থিব অনন্ত সুখে সুখী হইতে পারিবেন কিরূপে? আপনার জ্ঞান-নয়ন প্রস্ফুটিত হইবার এখনও বিলম্ব আছে।"

উন্মত্ত আত্মহারা মনসুর মনের আবেগে জলদগম্ভীরে এত দূর বলিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। উত্তাল তরলসঙ্কুল জলধি সহসা যেন স্থির—তরঙ্গ-রহিত হইল। তখন সৈয়দ সাহেব তাঁহার এইরূপ স্পর্দ্ধা-সম্বলিত তেজস্কর বাক্য শুনিয়া হতাশ-মলিন মুখে মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। চিত্র-পুত্তলিকাবৎ ক্ষণকাল নীরব ও নিস্পন্দ! অতঃপর আর বাক্য-ব্যয় বৃথা জানিয়া ধীরে ধীরে স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই ঘটনায় সাধারণ জনগণ ক্রোধে অধিকতর উত্তেজিত ও অধীর হইয়া উঠিল। "মৃত্যুকালে বিপরীত বুদ্ধি ঘটে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, সে লক্ষণ মন্‌সুরের যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। এখন হিতগর্ভ উপদেশ বা প্রবোধ প্রদান, ইহার কিছুই ফলপ্রদ

হইবে না। স্বয়ং মহামান্য মোরশেদ যখন কুশল সাধন করিতে গিয়া অপদস্থ ও নৈরাশ্য-সন্তপ্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন, তখন আর ইহার মঙ্গল কোথায়?” এইরূপ নানা জনে নানা কথা-উত্থাপন করিয়া মহর্ষির প্রাণ-সংহারের নিমিত্ত অধৈর্য্য ও আগ্রহাতিশয্য দেখাইতে লাগিল।

তখন কতিপয় ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তি বলিলেন, “মন্‌সুর মহা-পরাধী—প্রাণদণ্ডার্হ সত্য বটে, কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত ‘ফতোয়া’ ব্যতিরেকে কাহারও প্রাণদণ্ড হইতে পারে না। তাই বুদ্ধিমান্ উজির ধর্ম্মাচার্য্যদিগকে একত্র করিয়া ‘ফতোয়া’ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যিনি সর্ব্বজনগুরু, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সুফী-সঙ্ঘের সূর্য্য-স্বরূপ, সেই মহাতপা সৈয়দ শাহ্ জুনেদের অভিমত তো উজির গ্রহণ করেন নাই! এ বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।” সকলে এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া সৈয়দ জুনেদ শাহের নিকটে গিয়া ব্যবস্থাপ্রার্থী হইলেন। তখন জ্ঞানবৃদ্ধ শাহ্ প্রেমোন্মত্ত মন্‌সুরের সম্বন্ধে অভিমত দানের কথা শুনিয়া নিস্পন্দ ও নিরুত্তর রহিলেন,—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে গণ্ডস্থল বহিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, তাঁহার শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়া সহস্র ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে তাঁহার অন্তরাত্মা আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং তাহাতে যে তিনি কিরূপ বেদনা বোধ করিলেন, তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপরের বোধগম্য নহে। ফলতঃ তিনি যে অকৃত্রিম প্রেমোন্মত্ত মন্‌সুরের আসন্ন বিপদে মর্ম্মান্তিক

আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, তাহা বুঝিতে কাহার আর বাকী রহিল না।

ফতোয়া-প্রার্থীরা সৈয়দ সাহেবের অবস্থা দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও তাঁহার অভিমত প্রদানের অভিপ্রায়ের কোন ভাবই লক্ষিত হইল না,—একটী বাক্যও তাঁহার মুখে স্ফুরিত হইল না। তিনি কেবল নীরবে কাতর ভাবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ব্যবস্থাপ্রার্থী ব্যক্তিগণ অতিশয় বিরক্ত হইলেন,—কাহার কাহার ধৈর্য্যচ্যুতিও ঘটিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? নানা কারণে সে অধৈর্য্যবেগ সম্বরণ করিতে হইল। রাজ্যাধিপতি খলিফার গোচর করিলে সহজেই ইহার প্রতীকার হইবে বিবেচনায় সকলে সমবেত হইয়া অবশেষে মহামান্য খলিফার দরবারে উপনীত হইলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা যথাবিধি তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন।

দরবারে বিচারকার্য্যে নিয়োজিত জনৈক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী আগন্তুকগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া চমকিত হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিয়া বিনীতভাবে খলিফাকে কহিলেন,—"জাঁহাপনা! মাননীয় উজির সম্মিলিত আলেমগণের স্বাক্ষরিত ফতোয়া হস্তগত করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দুরূহ কার্য্য কার্য্যে পরিণত করিবার অগ্রে শ্রদ্ধেয় তাপস সৈয়দ জুনেদ শাহের অভিপ্রায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু তিনি দরবেশকুলের শ্রেষ্ঠ এবং সুফী-সঙ্ঘের গুরুস্থানীয়, তিনি যে ব্যবস্থা প্রদান করিবেন,

তাহাই সর্ব্ববাদিসম্মত ও শিরোধার্য্য হইবে। তাই পুনঃ নিবেদন করিতেছি, তাঁহার মত গ্রহণ না করিয়া একার্য্যে অগ্রসর হওয়া অবিধেয়।"

খলিফা আল্ মোক্তাদীর বিল্লাহ্ প্রজারঞ্জক, ন্যায়বান্ ও নিতান্ত ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি। তাঁহার শাসনশৃঙ্খলা ও সুবিচারের তো কথাই ছিল না, কিন্তু সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের দিকে সতত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকায় বিধাতার কৃপায় তদীয় সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য-মধ্যে ইস্লামের খেলাপ কোন একটী সামান্য কার্য্য সংঘটিত হওয়া দূরে থাকুক, একটী বিরুদ্ধ বাক্যও উচ্চারিত হইতে পারিত না। কিন্তু আজ এক বিষম বিপরীত ভাব দেখিয়া তিনি সাতিশয় মর্ম্মাহত, বিস্মিত, বিচলিত ও চিন্তাকুল হইলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি অজ্ঞান বা সাধারণ লোক হইলে ভাবিবার অধিক প্রয়োজন ছিল না, পরন্তু ইনি তো যে-সে ব্যক্তি নহেন, ইনি মহাজ্ঞানী দরবেশ মন্সুর—মন্সুরের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের অভিযোগ! কি সর্ব্বনাশকর ঘটনা! ইহা যে ভাবিবারই ক্ষেত্র। বিশেষতঃ ধর্ম্মাধিকরণে উপবিষ্ট হইয়া আনু-পূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করাই যথার্থ সুবিচারক ও সর্ব্বলোকে প্রশংসিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যিনি তাহাতে অক্ষম, যাঁহার সে দৃঢ়তা নাই, সেই দুর্ব্বলচেতা ভীরু মানব ধর্ম্মজগতের পরিরক্ষক খলিফা-পদবাচ্য নহেন, তিনি সুবিচারক ও প্রশংসার্হ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেও পারেন না। এই ধারণা বশতঃ বিচক্ষণ খলিফা আল্ মোক্তাদীর বিল্লাহ্

স্বয়ং চিন্তাবিহ্বলচিত্তে বাদী-প্রতিবাদী-স্বরূপে মনে মনে বহু বাদানুবাদ, বহু তর্কবিতর্ক করিলেন। পরিশেষে বুঝিলেন, ইস্‌লামের অপ্রতিহত প্রভাব খর্ব্ব-করণে-উদ্যত মন্‌সুর দণ্ডের যোগ্য বটেন। তখন রাজকর্ম্মচারীর কথা যুক্তিমূলক বিবেচনা করিয়া তিনি ফতোয়া প্রদান জন্য শাহ্‌ সুফী সৈয়দ জুনেদের নিকট পত্র প্রেরণে বাধ্য হইলেন।

পত্র লিখিত হইল। আজ্ঞানুসারে রাজকীয় লেখক লিখিলেন, "মহাত্মন্! উন্মত্ত মন্‌সুর সুনির্ম্মল ইস্‌লাম ধর্ম্মে যে কি দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা প্রলেপন করিতে—চিরন্তন সরল বিশ্বাসের মূলে সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আজ মোস্‌লেম সমাজ তাঁহার সেই কৃতাপরাধের—সেই ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিবিধান করিতে বদ্ধপরিকর। আপনি সুফী, দরবেশ এবং আলেমকুলের মুকুট-মণি, আপনার ধর্ম্মাচরণের তুলনা নাই। ধর্ম্মের অবমাননা আপনার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ বাণের ন্যায় যাতনা প্রদান করে। অতএব আশা করি, মন্‌সুরের এই অকথ্য আচরণের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত শাস্ত্রানুমোদিত যে ব্যবস্থা হয়, তাহা প্রদান করিয়া সত্য সনাতন ইস্‌লামকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে আপনি ত্রুটি করিবেন না। অঙ্কুরে ইহার মূলোৎপাটন না করিলে কালে ইহা শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া ধর্ম্মজগতে নিদারুণ বিপ্লব উপস্থিত করিতে পারে, আপনার ন্যায় ভবিষ্যদ্দর্শী ব্যক্তিকে একথা লেখাও বাহুল্য মাত্র।"

খলিফার স্বাক্ষরিত এই পত্র প্রেরিত হইল। অভিযোক্তাগণও যথারীতি নম্রতার সহিত খলিফাকে অভিবাদন করিয়া পত্রবাহকের সহিত চলিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না, খলিফার লিপি পাইয়া কোলাহল করিতে করিতে সকলে ছুটিলেন এবং ব্যস্ততার সহিত মাননীয় জুনেদ শাহের হস্তে পত্র অর্পণ করিলেন। জনসঙ্ঘ 'ফতোয়া'-প্রাপ্তির আশায় চারিদিকে দণ্ডায়মান,—সতৃষ্ণ নয়নে 'ফতোয়া'-দাতার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। এদিকে সুফী জুনেদ শাহ্ কিন্তু পূর্ব্ববৎ নীরব, নিরুত্তর ও কাতর-ভাবাপন্ন। তিনি প্রথমতঃ খলিফাপ্রদত্ত পত্রখানি সম্মাননার সহিত গ্রহণ পূর্ব্বক চুম্বন করিলেন, তৎপরে পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি লোমহর্ষণ—কি বেদনাব্যঞ্জক ব্যাপার! পাঠমাত্র তাঁহার বিষাদ-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, দরবিগলিত অশ্রু-ধারে লিপি অভিসিক্ত হইয়া গেল। ধৈর্য্যহীন আগন্তুকের দল ব্যবস্থাদাতার এই লক্ষণ তাঁহাদের আশাপ্রদ নহে দেখিয়া, কিছুক্ষণ পরে পুনর্ব্বার খলিফার দরবারে গিয়া অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। স্থিরধী খলিফা তাহাতে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইলেন না—ফতোয়ার জন্য পুনঃ অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন। এইরূপে ছয় বার আগন্তুক-দলের আগমন,—ছয় বার পত্র প্রেরিত হইল, তথাপি 'ফতোয়া' হস্তগত হইল না,—ফতোয়া-দাতার মনের ভাব পূর্ব্বের ন্যায় অপরিবর্ত্তিত, অচল ও অটল!—হাঁ কিংবা না, ইহার কোন কথাই তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল না।

এদিকে নগরবাসীদের উত্তেজনার বিরাম নাই। তদ্দর্শনে মহামান্য খলিফা সপ্তম বার শাহ্‌ জুনেদের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। তখন সেই বৃদ্ধ তপস্বী বিষম বিরক্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু বারংবার রাজাজ্ঞা অবহেলন বা প্রত্যাখ্যান করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। যদি করেন, তাহা হইলে সাধারণের অপ্রিয়ভাজন, দেশ-বিদেশে নিন্দিত এবং খলিফার কোপে পতিত হইলেও হইতে পারেন। বিশেষতঃ পবিত্র 'শরিয়ত'কে অক্ষুণ্ণ ও গৌরবান্বিত রাখাও সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। মনোমধ্যে এইরূপ নানা চিন্তার আবির্ভাব হওয়ায় তিনি পরিশেষে বাধ্য হইয়া ব্যবস্থা প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন।* তখন তিনি আল্লাহ্‌-তা'লার পবিত্র নামোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ সুফীর সজ্জা (আধ্যাত্মিক পরিচ্ছদ) পরিত্যাগ করিয়া লৌকিক কাজীর পোষাক পরিধান করিলেন। অনন্তর চিন্তিতচিত্তে লেখনী গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে মহিমময় আল্লার মহান্‌ নামের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেন, পরে কৌশলের সহিত লিখিলেন,—"যে ব্যক্তি নির্ব্বিকার নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লার অংশী স্থাপন করে, ঐশিক দাবী-

* এব্‌নে খাল্লিকানের ইতিহাসে মহর্ষির প্রাণদণ্ড হিজরী ৩০৬ সালে এবং শাহ্‌ জুনেদের তিরোভাব হিজরী ২৯৮ সালে ঘটে, লিখিত আছে। যদি তাহাই হয়, তবে মন্‌সুরের বিরুদ্ধে তাঁহার ফতোয়া প্রদান ও তৎসহ তর্ক-বিতর্ক করা একেবারে অলীক ও অসম্ভব হইয়া পড়ে। এদিকে "তাজকেরাতল আউলিয়া" গ্রন্থে মন্‌সুরের প্রাণদণ্ড সময়ে শাহ্‌ জুনেদের বিদ্যমানতা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে উক্ত খাল্লিকানের কাল-নির্ণয় অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস্য নহে।

দাওয়া করে, সে নিন্দিত, ঘৃণিত, কাফের, ইস্‌লাম-বিরোধী ও মহাপাপী। শরিয়তের বিধানানুসারে যদি ইহার প্রকাশ্য ফতোয়ার প্রয়োজন হয়, তবে তাহার শিরশ্ছেদনই প্রশস্ত প্রায়শ্চিত্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার অন্তরের অবস্থা মানবের অজ্ঞাত, তাহা একমাত্র আল্লাহ্-তা'লাই জানেন।"

শাহ্ জুনেদ এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া আগন্তুকদিগের হস্তে প্রদান করিলেন। তাঁহারা ফতোয়া পাইয়া জুনেদ শাহ্‌কে অভিবাদন পূর্ব্বক মহানন্দে কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন
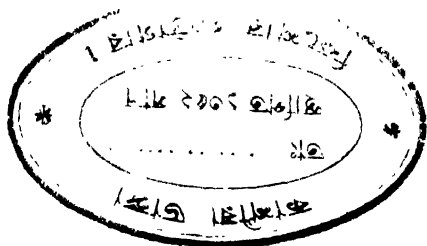
অষ্টম পরিচ্ছেদ

'ফতোয়া' হস্তগত হইয়াছে, মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে ; নগর-বাসীদের আর আনন্দের সীমা নাই। খলিফার আদেশে আজ মন্‌সুরের প্রাণদণ্ডের দিন। শৃঙ্খলিত মন্‌সুর সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া বধ্য-প্রান্তরে আনীত হইয়াছেন। তাই দলে দলে লোক আসিয়া সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমবেত হইতেছে। ধনী মধ্যবিৎ দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ যুবক, পণ্ডিত শিক্ষার্থী মূর্খ, মূক খঞ্জ বধির,—কেহই আর আবাসে নাই, সকলেই চলিয়াছে, প্রখরগতি নদী-স্রোতের ন্যায় মনুষ্য-স্রোত চলিয়াছে। রাজপথ জনতাপূর্ণ—কোলাহলময়, কল্‌-কল্‌ গল্‌-গল্‌ শব্দে সমগ্র বাগ্‌দাদ নগর শব্দায়মান, আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত—গম্‌-গম্‌ করিতেছে। সহস্র সহস্র নরকণ্ঠস্বর একত্র সংমিশ্রিত হইয়া এক গম্ভীর শব্দ উৎপাদন করিতেছে। দূর হইতে সেই শব্দ অধিকতর ভীষণ ও গম্ভীর অনুমোদিত হইতেছে। কত জনে কত কথা বলিতেছে। কত বাক্‌বিতণ্ডা, কত হা-হুতাশ, কত শ্লেষ-বিদ্রূপ, কত পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইতেছে। কেহ উৎফুল্ল নয়নে তামাসা দেখিবার জন্য খল্‌ খল্‌ করিয়া হাসিয়া বেড়াইতেছে, কেহ বা বিষণ্নচিত্তে নীরবে সমবেত মানবমণ্ডলীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কেহ বা "হা হতভাগ্য মন্‌সুর! শেষে তোমার ভাগ্যে এই

ছিল!" বলিয়া অবশাঙ্গে বসিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। কেহ বা বলিতেছে, "ধর্ম্মদ্রোহীর কঠিন শাস্তি হওয়াই উচিত, তাহাতে কাহারও ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই।"

মন্‌সুরের সহাধ্যায়ী দরবেশ শেখ আবুবকর শিব্‌লী বন্ধুর এই দৈব দুর্ব্বিপাকে সমধিক মর্ম্মাহত ও বিষণ্ণ। তাঁহার হৃদয়ে যেন পাষাণ পিষিয়া যাইতেছে। যদি কোন প্রকারে এই বিপত্তির নিরাকরণ করিতে পারেন, যদি কোন কৌশলে মন্‌সুরের মনের গতি ফিরাইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি শশব্যস্তে মন্‌সুরের সমীপস্থ হইলেন এবং বহুবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করার পর দুঃখের সহিত প্রবোধ-বাক্যে কহিলেন, "ভাই, জানিয়া শুনিয়া আপনার প্রাণ আপনি বিসর্জ্জন করিতে চলিলে! ইহা কি তোমার ন্যায় সুপণ্ডিত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির অনুরূপ কার্য্য? যে হৃদয় সুদৃঢ় নগরাজ সদৃশ অটল ও অদম্য ছিল, আজ তাহা সহসা বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হইল কেন? কোন্ সূত্রে কোথা হইতে এই চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত হইয়া তোমাকে এই নিদারুণ অবস্থায় পাতিত করিয়াছে? তোমার সেই অবিচলিত অধ্যবসায়, সেই অমানুষিক সহিষ্ণুতা, সেই দেব-দুর্লভ ইন্দ্রিয়-সংযম, সেই প্রখর বিবেকবুদ্ধি আজ কোথায়? গুরূপদেশের কি এই পরিণাম? নির্জ্জন ধ্যান-ধারণা, অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান শেষে কি অজ্ঞানতায় পর্য্য-বসিত হইল? যে বিষয় এক ব্যক্তি সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু জগৎ অসত্য ও অন্যায় জ্ঞানে ঘৃণা, নিন্দা ও

বিপক্ষতা করিয়া থাকে, এবংবিধ কার্য্য হইতে নির্লিপ্ত থাকাই শ্রেয়ঃ। তোমার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কথাও কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে? কিন্তু তথাপি বন্ধুত্ব ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতেছি, তোমার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে সংযত কর, আলোড়িত চিত্তকে সুস্থির কর। এখনও নিরস্ত হও, রসনাগ্রে সেই অবৈধ উক্তিটীর আর প্রবেশাধিকার দিও না, অন্তর হইতে সেই বিঘ্নকারী স্মৃতিমূল উন্মূলিত করিয়া ফেল। দেখি, আজ কোন্ ব্যক্তি তোমার প্রতিকূলে আর বাক্যমাত্র ব্যয় করিতে অগ্রসর হইতে সাহস করে? এই যে সমবেত অগণ্য লোক রোষকষায়িতলোচনে তোমার প্রাণ-হরণে—তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত, দেখিবে, এই মুহূর্ত্তেই তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সাদর সম্ভাষণে তোমাকে হিতবান্ বন্ধু জ্ঞানে আলিঙ্গন করিবে। তাই বলিতেছি, ভাই! শান্ত হও, ধৈর্য্য ধারণ কর, হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করিতে সচেষ্ট হও।"

বাক্যস্রোত রুদ্ধ হইল। মনসুরের কর্ণকুহরে বন্ধুর এই শীতল বাক্য প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু মনোমধ্যে ক্ষণকালের জন্য স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইল না। বিজনারণ্যে রোদনের ন্যায় তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। দর্শিবেই বা কি প্রকারে? যখন প্রেমোদ্দীপ্ত—মোহাভিভূত পতঙ্গ অকৃত্রিম প্রেমাবেশে ক্ষিপ্ত হইয়া সমুজ্জ্বল দীপশিখা আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হয়, কিন্তু যে পতনমাত্রই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে, তখন তাহার সে আশঙ্কা বা সে জ্ঞান কি থাকে? কখনই নহে। সেই জন্যই

এই আসন্ন বিপদেও মন্‌সুর বিকারশূন্য—চিন্তার লেশমাত্র নাই, হাসিতে হাসিতে অম্লানবদনে উত্তর করিলেন,—"দয়াদ্র্র সখে! সমস্তই বুঝিয়াছি, আমি সমস্তই জানি; কিন্তু আর গভীর অনুশোচনায় বা তীব্র তিরস্কারে ফল কি? তোমার উপদেশ-রূপ অঙ্কুশ-প্রহারেও আমার উন্মত্ত মনোমাতঙ্গ বারণ মানিতে চাহে না। আমি যে সেই জন্মমৃত্যুনিয়ন্তা, ভাগ্যলিপিপ্রণেতা মহান্ আল্লার নামে জীবনোৎসর্গ করিয়াছি। প্রাণের প্রতি আর মায়া নাই,—মমতা নাই,—স্নেহ নাই,—সমস্তই বিদায় দিয়াছি,—চির বিদায় দিয়াছি। ভয় কিসের? আর কাহার ভয় করিব? পাষাণ করিয়াছি হৃদয়। হউক শত বজ্রপাত, এ হৃদয় পাতিয়া দিব! ভাই! আমি প্রেমময়ের প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত—উত্তাল তরঙ্গ-তাড়নায় হাবু-ডুবু খাইতেছি, উঠিবার সামর্থ্য নাই। এ সমুদ্র অপার, অসীম, অতলস্পর্শ। আমি দিক্‌হারা—যে দিকে তাকাই, দেখিতেছি কেবল অনন্ত জলরাশি থৈ থৈ—তর তর করিতেছে। হায়, অশেষ যত্নে—প্রাণপণ শক্তিতে অন্বেষণ করিয়াও ইহার তীরভূমি পাইবার উপায় নাই। ফলতঃ বিপদের ভ্রূকুটিতে আমি আর শঙ্কিত নহি। কারণ শাস্তি এবং সুখ, উভয়ই আমার পক্ষে তুল্য। সখে! আমি তো এখন জীবনী-শক্তিরহিত জড়পিণ্ড! আমি তো মৃত!! কি আশ্চর্য্য, মৃত ব্যক্তিকে মরিতে হইবে বলিয়া কি পুনঃ ভয় প্রদর্শন করিতে হয়? মরার উপর খাঁড়ার প্রহার মূর্খের কার্য্য —নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্ব্বাচীনের প্রস্তাব! ভাই, তোমরা

আর আমাকে মন্‌সুর বলিয়া ডাকিও না—জানিও না ; এখন আমি আর তোমাদের সেই মন্‌সুর নহি। আমার আমিত্ব কোথায় ? প্রেমময়ের সত্তায় আমার আমিত্ব মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, ডুবিয়া গিয়াছে। আকাশ পাতাল এক হইয়াছে। একাকার ! একাকার !! সব একাকার !!! অগ্র-পশ্চাৎ, দক্ষিণ-বাম, ঊর্দ্ধ-অধঃ যে দিকেই নেত্রপাত করি, সব একাকার দেখিতেছি—এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। যদিও সংপ্রতি আমি মন্‌সুর নামে অভিহিত, কিন্তু সেই একের একত্ব হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহি ! আমার এই শরীরে সেই অদ্বিতীয়ের ঐশ্বর্য্য গুপ্ত নাই এবং এই নামে তাঁহার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য অপ্রকাশ নাই ! হায় হায় ! বাহ্য দৃশ্য দেখিয়াই জগৎ বিমোহিত। আভ্যন্তরিক মধুর ভাব দেখিতে জগতের চক্ষু নাই, অথবা অসমর্থ। কাহারও কি চক্ষু নাই ? কেহই কি স্পৃহণীয় গুপ্ত রহস্যোদ্ভেদ করিতে সমর্থ নহে ? সুগভীর রত্নাকর-গর্ভস্থিত মহামূল্য মুক্তা উত্তোলন করিতে ক্ষমবান্‌ ডুবারি কি একেবারেই বিরল ? অথবা হইতে পারে, জগৎ এ তত্ত্ব অনবগত ! কিন্তু আর বিলম্ব নাই ; শীঘ্রই এ কথা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইবে, জগতের নর-নারীর কর্ণে বাজিবে—চক্ষুষ্মান প্রেমিকগণের নিকটে এ দৃশ্য প্রতিভাত হইবে। অচিরে আমি আত্ম-বলিদান করিয়া আপনাকে নিরস্তিত্বে পরিণত করিব, সেই মহান্‌ প্রেমিকের প্রেমের জীবন বিসর্জ্জন করিয়া পরম সুখকর নবজীবন লাভসহ চিরস্থায়ী অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইব। আহা ! প্রেমে যে ব্যক্তি পরিপক্ক—

দক্ষ, প্রেমিকের প্রতিচ্ছায়া—প্রেমের অবস্থা তাহাতে পতিত ও প্রকাশিত হইবেই হইবে। যে বর্ণে বস্ত্র রঞ্জিত করিতে হইবে, বস্ত্রে তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলে সেই বর্ণ কি তাহাতে প্রতিফলিত হয় না? রঞ্জিত বস্ত্র সবাই দেখে, দেখিয়া প্রশংসা করে, কিন্তু সে রঙ কেমনে আসিল, কোথা হইতে আসিল, কে রঙ ধরাইল? সেটী কেহ তলাইয়া বুঝিতে চায় না—সে দিকে মন দেয় না। ভাই শিব্‌লী! বল দেখি আমি কি পৃথিবীতে সত্য গোপন করিয়া যাইব? আর সত্য গোপন করিবই বা কেমন করিয়া? সত্য গোপনে যে মহাপাপ! অন্তরে যে ভাব, যে তাহা মুখে ব্যক্ত না করে, সেই কপট কুক্কুরের দয়াময়ের দ্বারস্থ হইবারও অধিকার নাই। আমার অচিরস্থায়ী দেহের পতন হয় হউক, ক্ষতি কি? তাহার সুখ-সাধনোদ্দেশে এই পাপে অবিনশ্বর আত্মাকে কলুষিত করিতে আমি সম্মত নহি। আমি কখনই এই সত্য প্রচারে পরাঙ্মুখ হইব না; কাহারও কথা শুনিব না, কোনও প্রতিবন্ধক মানিব না; তাহাতে জগৎ শত্রু হয়, হউক; খলিফা যে শাস্তি দিবেন, দিউন; অবনত মস্তকে সহাস্যে সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ বা একটী প্রতিবাদও করিব না। তাই বলিতেছি,—

প্রিয় সখে! প্রাণপণে অতি করিয়া যতন
কি আর অধিক বুঝাবে বল;
বুঝিবার যাহা, বুঝিয়াছি তাহা,
তার চেয়ে নাহি বুঝিতে বল।

শাস্ত্রমহাসিন্ধু করি' আলোড়ন
সহস্র প্রমাণ কর প্রদর্শন,
অশেষ যুকতি, প্রবোধ ভারতী,
অথবা দেখাও প্রাণের ভয়—
সব অকারণ, বুঝিবে না মন,
কিছুতেই কিছু হবে না ফল।

সুদৃঢ় কঠিন করিয়াছি হিয়া,
পড়ুক অশনি ঘোর গরজিয়া,
অনা'সে লইব এ বুক পাতিয়া,
যাতনা যতই হোক রে তায়—
যথা হিমাচল স্থির অবিচল,
তথা রবে মন চির অটল।

দেখে হাসি পায়, এরা কি অজ্ঞান!
গিরি-পাদমূলে করি' অবস্থান,
শৃঙ্গবাসী জনে লোষ্ট্র-নিক্ষেপণে
নীচে নিপাতিত করিতে চায়!
রবি-শশি-তারা নামে কি হে ধরা?
নামে কি ভূতলে জলদদল?

সাধকের আঁখি করিয়া বিকাশ
দেখ দেখি চেয়ে তব চারি পাশ!

গ্রহ, উপগ্রহ, শূন্য, গন্ধবহ,
অনল, সলিল, ভূধরচয়—
তিনিময় সব, তিনিময় ভব,
তিনিই বিটপী, তিনিই ফল।

পুষ্পরূপে আহা তিনিই প্রকাশ,
তিনিই গগনে বিজলীর হাস,
ঝটিকা-উছাস, মরুভূর ত্রাস,
তিনিই আঁধার আলোকময়—
প্রকাশ্য গোপন, নব পুরাতন,
আদি অন্ত তিনি মধ্যস্থল।

অলি-ছলে তিনি নিজ গুণ গান,
কুলিশে অতুল প্রতাপ জানান,
ভূমির কম্পনে জাগ্রতে চেতনে,
উল্কাপাতে কহে হইবে লয়—
করুণ-কঠোর তিনি সর্ব্বতর,
বুঝেনাক ইহা আবোধদল।

আমি বিভেদ-পরদা ফেলেছি ছিঁড়িয়া,
জানি না কিছুই দ্বিতীয় বলিয়া,
এক আমি সেই, ভিন্ন কিছু নেই,
নিরখে নিয়ত নয়নদ্বয়,—

ইহ-পরকাল হ'য়েছে মিশাল,
একাকার ধরা পাতাল তল।

এক-(ই) আমি দেখি, দ্বিতীয় দেখি না,
এক বিনা দুই জানি না মানি না,
একে আমি ডাকি, একে খুঁজে থাকি,
একেই হৃদয় ডুবিয়া রয়—
ইথে যা তা হবে, সবি প্রাণে সবে,
চাই না শুনিতে ক্রূরের ছল।

সখে! জীর্ণ এ তনু-তরী অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়াছি। আর অনুযোগে ফল কি? সমাজের মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে দাও। যদি আমি ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়াই প্রমাণিত হইয়া থাকি, তবে কি এই অকিঞ্চন পাপীকে রক্ষার্থ প্রয়াস পাওয়া অবোধের পরিচায়ক নহে? শীঘ্রই এ দীন মূর্ত্তি নরলোক হইতে অদৃশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু একটী নিবেদন,—আমি সাধারণের নিকট একটী দিনের জন্য অবসর প্রার্থনা করি—একটী দিনের অপেক্ষা করিতে হইবে। আগামী কল্য শিরাজ নগর হইতে এক প্রিয় বন্ধুর এখানে শুভাগমন হইবে। তিনি সমধিক বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভাসম্পন্ন অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং ধার্ম্মিক বলিয়াও জগৎ-প্রসিদ্ধ। মারফত-তত্ত্বে তাঁহার অধিকার যথেষ্ট আছে। তিনি জনসমাজে শেখ কবির বলিয়া পরিচিত। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ এবং ক্ষণকাল আত্মবৃত্তান্ত জানাইয়া কথোপকথন

করিতে বাসনা করি। আমার এ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইলে তোমাদের অভিলষণীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে আর ক্ষণবিলম্বও সহ্য করিও না।”

বিজ্ঞবর আবুবকর শিব্‌লী মহর্ষি মন্‌সুরের এই সদর্থযুক্ত সতেজ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া নিরুত্তর হইলেন ও তাঁহার জীবন রক্ষায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি মহর্ষির শেষ আবেদন সাধারণ্যে জ্ঞাপন করিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর সেই প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি প্রদান করিল। কোন কোন গোঁড়ার দল শুভ কার্য্যে বিলম্ব ঘটিল অথবা ভবিষ্যতে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বলিয়া নাসিকা কুঞ্চনপূর্ব্বক ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল।
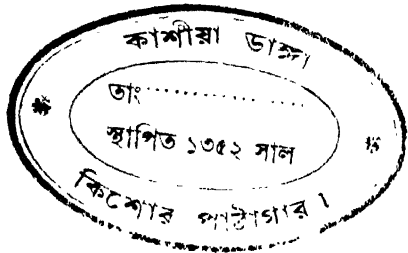
নবম পরিচ্ছেদ

মহামান্য খলিফার অনুগ্রহে মনস্মুরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এক দিনের জন্য স্থগিত হইয়াছে—আর একটী দিনের জন্য তিনি ইহলোকে অবস্থিতি করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া সমবেত নগরবাসিগণের কেহ কেহ গৃহাভিমুখী হইল। কিন্তু অনেকেই উত্তেজনাধিক্য বশতঃ সেই স্বল্প সময়ের জন্য আর বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না; নগর-বহির্ভাগে সুকোমল মখমল-সদৃশ শ্যামল দুর্ব্বাদল-ক্ষেত্রেই আনন্দ-কোলাহলে যামিনী যাপন করিতে মনস্থ করিল।

কোন কার্য্যের অপেক্ষায় উৎসুক ও উদ্বিগ্নচিত্তে সময়াতি-বাহিত করার চেয়ে আর যন্ত্রণা নাই। তখন সময় যেন অতীব দীর্ঘ হইয়া পড়ে, একটী মুহূর্ত্ত একটী যুগ বলিয়া অনুমিত হয়, সময় কিছুতেই কাটিতে চায় না। প্রান্তরস্থিত নাগরিকগণ আজি এই অবস্থায় অবস্থিত। সকলেই চঞ্চল ও অস্থিরচিত্ত, তাহাদের সময় আর কাটিতেছে না। কখন্ প্রভাত হইবে, কখন্ সূর্য্য উঠিবে, কখন্ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কার্য্যে পরিণত হইবে, প্রত্যেকে তাহাই ভাবিতেছে—সেই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কত মনোরঞ্জন উপকথা বলিয়া, কত রঙ্গরস, কত বৈষয়িক জল্পনা ও কত ধর্ম্মালোচনা করিয়া দলে দলে ইতস্ততঃ পাদচারণ

করিতেছে। তথাপি অনাবশ্যক কাল অতীতের গহ্বরে ডুবিতে চাহিতেছে না—ঈপ্সিত কালের দেখা হইতেছে না। কিন্তু কিছুই চিরস্থির নহে। দেখিতে দেখিতে ত্রিযামার যামত্রয় অনন্তের গর্ভে অলক্ষ্যে বিলীন হইয়া গেল। শ্বেতরশ্মি নিশাকর ক্লান্ত কলেবরে পশ্চিম আকাশের দিকে ঢলিয়া পড়িল। ক্রমে কনককান্তি নক্ষত্রকুল আপনাদের জীবনকালের স্বল্পতা উপলব্ধি করিয়া ত্রাসে নিষ্প্রভ ও ব্যথিত হইয়া টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নিশাবসানের পূর্ব্বদূতস্বরূপ মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গমসমূহ কলস্বনে দিগন্তের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিল। সেই কল-কাকলী সুখ-স্পর্শ পবন-বাহনে আরোহণ করিয়া তর-তর-বেগে দূর-দূরান্তে ছুটিয়া চলিল। সহসা উদয়াচল-চূড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিমিরারি দিনমণি দিব্য কান্তি দেখাইয়া মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে নভস্তলে সমুপস্থিত,—রজনী প্রভাতা হইল। নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে—তপনের তরল কিরণচ্ছটায় নীলাকাশ মনোরম অনুরঞ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মন্‌সুরের কথিত সেই সুধী পুরুষের আগমন-বার্ত্তা জনতার মধ্য হইতে বিঘোষিত হইল। তিনি প্রান্তরে লোক-সমাগম দর্শনে ও তাহাদের বাক্-বিতণ্ডা শ্রবণে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন; শেষে হতাশব্যাকুল মনে মন্‌সুরের দিকে শশব্যস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অসহিষ্ণু জনস্রোতও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

এই সর্ব্বজন-সুপরিচিত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মন্‌সুরের সম্মুখীন হইয়া প্রথমতঃ যথাবিহিত সাদর সম্বোধনে তাঁহাকে আপ্যায়িত

করিলেন। অনন্তর কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর অনুতাপের সহিত ধীরগম্ভীরে কহিলেন, "সখে! ধর্ম্মাচরণে ও পাণ্ডিত্যে আপনি জগৎপ্রসিদ্ধ। আপনার তুল্য পারমাথিক তত্ত্বজ্ঞান-বিশারদ ব্যক্তি অতি বিরল। কিন্তু বলুন, কি জন্য সেই নিগূঢ় তত্ত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া—খনিস্থিত লুক্কায়িত মণির ন্যায় উজ্জ্বল সত্য প্রচারে উদ্যত হইয়া অবিজ্ঞ মূর্খের সদৃশ আপনাকে ভীষণ বিপদে পাতিত করিলেন। আজ আপনি শত্রুপরিবেষ্টিত, জগতের বিচারে অপরাধী। যাঁহারা আপনার আত্মীয়-স্বজন, যাঁহাদের নিকটে আপনি সর্ব্বথা সম্মানিত ও আদৃত ছিলেন, যাঁহাদিগকে আপনি পরম মিত্র জ্ঞান করিতেন, তাঁহারাই আজ ধর্ম্মের অনুরোধে—সমাজের প্ররোচনায় আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। আপনি একাকী, অসহায় এবং দুর্ব্বল। প্রবলের নিকটে দুর্ব্বলের পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা তো আপনি বিদিত আছেন। আপনার কথিত বাক্যের গভীর তাৎপর্য্য সেই সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ্-তা'লা এবং তাঁহার অনুগৃহীত সাধক পুরুষ ব্যতীত অপরে বুঝিতে অশক্ত। এতএব যাহা জগৎ বুঝে না, যাহা সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য, তাহা সত্য হইলেও অসত্য, অভ্রান্ত জানিলেও ভ্রান্ত বিশ্বাসে পরিহার করা অবশ্যকর্ত্তব্য, মনুষ্য-সমাজে সেই কঠিন জটিল সমস্যার মর্ম্মপ্রকাশ করিতে নিরস্ত থাকাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত। যে তত্ত্ব গুপ্ত, তাহা চিরগুপ্তই থাকুক। লোকে স্বীয় ধনসম্পত্তির নিরাপদ জন্যই তাহা গুপ্তভাবে রাখিয়া থাকে এবং তজ্জন্য সদা শঙ্কিতচিত্তে

বাস করে। কিন্তু বলুন দেখি, আপনি কোন্ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এবং কি জন্য তাহা প্রকাশ করিয়া স্বেচ্ছায় দস্যু-তস্করের কোপদৃষ্টিতে পড়িলেন? আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল অতীত হইতে চলিল, জ্বালাময় অনলরাশি অন্তরে ধারণ করিয়া আপনি অবিচলিতভাবে অবস্থান করিয়া আসিতেছেন; কখনও আপনার স্বাভাবিক ভাবের পরিবর্ত্তন বা ব্যত্যয় ঘটিতে দেখি নাই; কখনও আপনার সাধক-জনোচিত সহিষ্ণুতার লাঘব হইতে শুনি নাই। কিন্তু হায়! সংপ্রতি এ কি অজ্ঞানান্ধের ন্যায় কার্য্য করিয়া বসিয়াছেন? এই অসহিষ্ণুতার—উন্মত্ততার কারণ কি? যাহা এত দিন অন্তরে রাখিয়াছিলেন, তাহা অন্তরেই পোষণ করিয়া রাখা কি উচিত ছিল না? এক্ষণে অধিক আর কিছু বলিবার সময় নাই, স্থিরচিত্তে আমার কথা শ্রবণ করুন। যে উক্তি লোকের শ্রবণকঠোর বোধ হয়, সমাজ যাহাতে অধর্ম্ম বিবেচনা করেন, যাহার প্রশ্রয় দিতে বালবৃদ্ধ কেহই সম্মত নহেন, আপনি এরূপ উক্তির উচ্চারণে ক্ষান্ত থাকিয়া আপনাকে বিপন্মুক্ত করুন, ইহাই আমার অনুরোধ।"

মনস্থর আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, "যদি মূর্খতাই না করিব, যদি আমার ধৃষ্টতাই না হইবে, তবে আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইব কি জন্য? নরচক্ষে—নরের বিচারে অপরাধ করিয়াছি বলিয়াই তো আমি অপরাধী! নতুবা নিরপরাধের কেশস্পর্শ করে কাহার সাধ্য? কিন্তু জানিবেন,

ইহা বিধিলিপি! বিশ্ব-মালেক হক্-তা'লা অদৃশ্য অক্ষরে ললাটফলকে যে সমস্ত ভাবী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, জীবনে তাহা ঘটিবেই ঘটিবে—কিছুতেই খণ্ডিত হইবার নহে। সুতরাং আমি স্বয়ং সাধ করিয়া যে আত্মনাশে উদ্যত হই নাই, ইহা স্থিরনিশ্চয়। ইহা সেই বিধাতারই কার্য্য। মনুষ্যের কি স্বাধীন ইচ্ছা আছে? আপনি তো সমস্তই অবগত আছেন এবং আমার বর্ত্তমান আন্তরিক ভাবও জানিতে পারিতেছেন। আমি অপার জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডবৎ প্রবল তরঙ্গ-তাড়নায় দোদুল্যমান। ইচ্ছা, স্থির থাকিব, কিন্তু থাকিতে পারি কৈ? সে শক্তি আমার কোথায়? মুহূর্ত্তমধ্যে সেই তরঙ্গ-তাড়নায় আমার অসংখ্যবার উর্দ্ধাধোভাবে উত্থান-পতন হইতেছে। সুতরাং আমার অর্গলহীন মুখ-দ্বার দিয়া অন্তরের বদ্ধমূল বাক্য উচ্ছ্বসিত হইয়া স্বতঃই বাহির হইয়া পড়িতেছে; তাহা রুদ্ধ করিতে আমার সামর্থ্য নাই,—প্রবৃত্তিও হয় না। অতএব যে কারণেই হউক, আমি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত পাত্র! আহা-হা কি আনন্দ! কি সুখদর্শন!! আজ সমুদয়ই আলোকময় দেখিতেছি—আকাশ-পাতাল-ভরা আলোক—একই প্রকার আলোক, দ্বিতীয়ালোক নাই। কি আশ্চর্য্য! কি মনোরম দৃশ্য এ! এমন ঔজ্জ্বল্য-লহরী লীলা তো কখন দেখি নাই!! নয়ন সার্থক হইল, হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। হে জ্ঞানময়! হে সর্ব্বনিয়ন্তা! বিলম্বে প্রয়োজন কি? বাগ্দাদাধিপতির—বাগ্দাদবাসিগণের এবং তৎসহ আমার মনস্কামনা শীঘ্র পূর্ণ

হউক। আর আপনি হে হিতৈষী সখে! যদি বাগ্দাদের আলেমগণ জিজ্ঞাসা করেন, তবে বিনা চিন্তায় 'শরিয়তে'র বিধানানুসারে আপনিও ইহার 'ফতোয়া' প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।"

সুবিজ্ঞ শেখ কবির মহর্ষি মন্‌সুরের এই তেজোময় বাক্য শুনিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি বিষম মর্ম্ম-বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, তাই অবশেষে মৃদুস্বরে কহিলেন, "ভাই! আপনার কথা সমস্তই সত্য। উহার মন্তব্য প্রকাশ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, কার্য্যটী কি মর্ম্মভেদী! কি বেদনাব্যঞ্জক!! এমত সঙ্কটস্থলে আমাকে 'ফতোয়া' লেখা কি সম্ভব হইতে পারে?" মন্‌সুর উচ্চ স্বরে কহিলেন, "পারে—পারে—অবশ্যই পারে। শরিয়তের বিধান—ইস্‌লামের হুকুম অমান্য করা আমার বাসনা নহে —আপনারও হইতে পারে না। শাস্ত্রমতে যখন আমি শূলাগ্রে প্রাণদণ্ডের যোগ্য, তখন আর কথা কি? তাহাতে নীরব থাকিয়া স্বীয় দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমার অনুরোধ, আপনি 'ফতোয়া' দিতে ইতস্ততঃ করিবেন না।"

এইরূপ বহুবিধ কথোপকথন হইল। সেই কথোপকথনের ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়ের মুখ হইতে কত নৈতিক উপদেশ, কত গূঢ় তত্ত্ব-কথা, কত প্রিয় প্রসঙ্গ বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু অল্পবুদ্ধি জনমণ্ডলীর তাহা বুঝিবার হৃদয় কোথায়? শক্তি

কোথায়? কিন্তু যে বুঝিল, সে মরমে মরিয়া মৃৎ-পিণ্ডবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া অবিরল অশ্রুধারে আপনার বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিল, তাহার অন্তর নৈরাশ্যে ডুবিয়া গেল। ব্যথিতপ্রাণ মহাত্মা কবির নীরব—আর অপেক্ষা করিলেন না; ধীরে ধীরে জনতা ভেদ করিয়া মনসুরের নিকট হইতে ম্লানমুখে বহির্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।
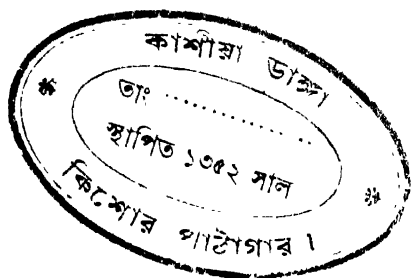
দশম পরিচ্ছেদ

সুধীবর শেখ কবিরের সহিত মহর্ষির বাক্যালাপ সাঙ্গ হইলে চারিদিক্ হইতে জনসঙ্ঘ কোলাহল করিয়া উঠিল। অনেকে মনসুরের কথিত মতে ফতোয়াপ্রার্থী হইয়া আগন্তুক শেখ সাহেবকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তিনি নীরব ও নিস্তব্ধ। তাঁহার মুখ মলিন—শুষ্ক। তাঁহার অন্তর বেদনা-ভারে নত—চিন্তার প্লাবনে অশান্ত। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া আকুলকণ্ঠে কহিলেন, "হে বাগ্দাদের ইস্‌লাম-সন্তানগণ! মহাপ্রাণ মনসুরের সহিত যে সমস্ত কথা হইল, তাহা আপনারা সকলে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি আজ আপনাদের নিকট বন্দী—শৃঙ্খলাবদ্ধ, কিন্তু তাঁহার প্রাণ—তাঁহার আত্মা মুক্ত—স্বাধীন। তাঁহার গুপ্তাবস্থা—আন্তরিক ভাব সেই সর্ব্বজ্ঞ খোদা-তা'লাই অবগত আছেন। তাহাতে তিনি অপরাধী কি না, তাহা তিনিই জানেন। তবে প্রকাশ্য অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিলে তিনি যে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী, তাহাতে সন্দেহ নাই। পবিত্র শরিয়তের বিচারে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। কিন্তু তজ্জন্য এত উতলা—এত ব্যাকুল কেন? যিনি খোদার পথে স্বয়ং আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাঁহার প্রতিকূলে ব্যবস্থার আবার কি প্রয়োজন? বিচারপতি কাজীই বা তাঁহার কি বিচার করিবেন? তিনি তো আপনার বিচার আপনি করিয়া রাখিয়াছেন! তোমরা যাহা চাহিতেছ,

তিনিও তাহাই চাহিতেছেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। দেখ, ইস্‌লামের এ কঠোর হুকুম মানিতে কি তাঁহার আগ্রহ ও সাহস! তাঁহার অন্তর উদ্বেগশূন্য, মুখ প্রফুল্ল।”

এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট ও শান্ত হইল। কিন্তু ইত্যবসরে অনেকগুলি নিষ্ঠুর ও উদ্ধত প্রকৃতির লোক বিলম্ব-জনিত বিরক্তিতে ব্যস্ত হইয়া প্রহরীর দ্বারা মন্‌সুরকে বধ্যস্থানে আনিয়া উপস্থিত করিল। অহো কি আক্ষেপ, সেই সময়ে সেই শুভ্রকর্ম্মা পুরুষের পবিত্র ও কোমল অঙ্গে কত ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত নির্দ্দয় রাক্ষসের কুলিশোপম কঠোর হস্ত পতিত হইল। কেহ কেহ আবার আরক্ত নয়নে তদাচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। আবার মহা কোলাহল—আবার মহা ধূম পড়িয়া গেল। সকলেরই দৃষ্টি সেই এক-ই কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইল। সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে, অন্তরে, অদূরে, সর্ব্বত্রই একটী কঠোর দৃশ্যের সৃষ্টি হইল। প্রান্ত-রের চতুর্দ্দিকেই যেন প্রলয়-তুফান বহিতে লাগিল, চতুর্দ্দিকেই বহু লোকের সমাবেশ। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় বধ্য-ভূমি লক্ষ্যে সুবিশাল বাগ্দাদ-নগরবাসীদের দ্রুত আগমনের বিরাম নাই; জন-কোলাহলে আকাশমার্গ গম্ গম্ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে শোকসূচক হাহাকার-ধ্বনি, কেহ বা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

“আজ প্রণয়-পরীক্ষার দিন! প্রেমিক স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া প্রণয়পাত্রের সম্মুখীন হইতেছেন, বিচ্ছেদের বিষাদময়ী রজনীর অবসানে সুখময় মিলন-প্রভাত সমুপস্থিত হইতেছে। প্রেমিক

ও প্রণয়াস্পদ নিয়ত নির্ভয়ে প্রণয়ার্ণবে নিমগ্ন থাকিবেন, আজ তাহার সূচনা হইতেছে। বিরহের বিষম চিন্তা আজ চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। বহু দিন হইতে যে হৃদয় শূন্য ছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইতে চলিল। দগ্ধ ক্ষতে শান্তিসুধার বর্ষণ হইতেছে। আজ খোদার অপার কৃপায় সাধকের চিরাভিলায সিদ্ধ হইতেছে।" এই প্রকার বহু বাক্যে যাবতীয় লোক, কেহ সুভাবে, কেহ বা রহস্য ও অসূয়াপরবশ হইয়া পরিহাস-প্রকাশক কণ্ঠে যাহার মুখে যাহা আসিল, সে তাহাই করিতে লাগিল। কিন্তু দৃশ্যটী কি লোমহর্ষণ! ঘটনাটী কি নৃশংস!! কার্য্যটী কিরূপ মর্ম্ম-স্পর্শী বেদনা-ব্যঞ্জক!! সে দিকে কাহার দৃষ্টি নাই; কার্য্যের গভীরতা পরিমাণ করিতে ও পরিণাম চিন্তা করিতে সকলেই অক্ষম। হা খোদা! হে প্রেমময় পরাৎপর প্রভো! প্রেমের কি পরিণাম এই? প্রেমিকের পুরস্কার কি এইরূপেই হইয়া থাকে? তুমি না রহ্‌মান—তুমি না রহিম! এই কি তোমার ভক্তের প্রতি রহম!! তোমার প্রেমে আবদ্ধ প্রেমিকগণ চির-কাল সুখ-শান্তিতে থাকিতে না পারিলেও লোকের ভক্তি, প্রীতি ও সম্মান লাভ করিয়াই আসিয়াছেন; কিন্তু কাহাকে কবে বিপক্ষের চক্রান্তে এহেন নিষ্ঠুররূপে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে? অহো! আজের এ ঘটনা নিখিল ধরণীধামে অভিনব, অলৌকিক, অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব।* ধন্য মহর্ষি মনসুর! ধন্য

* মহাত্মা যীশুখৃষ্ট (হজরত ঈসা) শত্রু কর্ত্তৃক শূলে আরোপিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই, তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন; ইহাই অনেক ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞের

তুমি অকৃত্রিম প্রেমিক! ধন্য তুমি সাধন-সহিষ্ণু ধর্ম্মবীর! ধন্য তোমার তত্ত্বজ্ঞানজনিত বৈরাগ্য! আজ তোমার বিচ্ছেদানল—হৃদয়ের সন্তাপানল নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, পীড়ার উপশম হইতে আর বিলম্ব নাই। ত্বরায় তুমি প্রিয় সহ প্রিয় সম্ভাষণে সম্মিলিত হইবে। হীনবুদ্ধি লোকেরা ভাবিতেছে, তুমি ভীষণ মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিতে এখানে আনীত হইয়াছ। কিন্তু তোমার মনে তো সে ভয়ভাবের লেশমাত্র নাই! তুমি ভাবিতেছ, তোমার সুখের পথ নিষ্কণ্টক হইতেছে; দুঃখময়ী অমানিশার অবসান হইতেছে। কখন্ সর্ব্ব-ভুবন-প্রকাশক দিনমণির শুভ্রালোকে চরাচর আলোকিত হইবে, তুমি সেই আশায় শুষ্ককণ্ঠ চাতকের ন্যায় সময় গণনা করিতেছ। বদনে চিন্তার ছায়াপাত মাত্র নাই, চিত্ত বিকাররহিত—প্রফুল্ল। মরি মরি কি মধুর! কি অভাবনীয় অমায়িক ভাব!! মহর্ষে! এ জগতে তুমিই তোমার একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল।

লোকারণ্যের মধ্যস্থলে উচ্চশির শালবৃক্ষসম মস্তক উন্নত করিয়া অগণিত ছাগ মধ্যে মহাবল শার্দ্দূলের মত সাহসে স্ফীত হইয়া মহামনস্বী মনসুর দণ্ডায়মান,—অন্তরে উদ্বেগের চিহ্ন নাই, মুখে বচন নাই—নির্ভয়, নিষ্পন্দ ও নীরব।

অভিমত। কিন্তু খৃষ্টিয়ানদিগের মতে যীশুখৃষ্টের শূলে আরোপিত হইবার ঘটনা যদি সত্যও বলিয়া ধরা যায়, তবে তাহাও এরূপ অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত উদাহরণ বা এরূপ অকৃত্রিম প্রেম-প্রকাশক নহে।

ভয় করিবেন কাহার? সাগর কি শিশিরের ভয় করে? মাতঙ্গের মনে কখন কি পতঙ্গের শঙ্কা জন্মে? আহা! মহর্ষির সে সময়ের ভাব অতি মধুর, অতি গম্ভীর ও প্রফুল্লতা-ব্যঞ্জক। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে যেন বিদ্যুচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে, শান্তোজ্জ্বল নেত্রদ্বয় কি এক মধুর ভাবে বিভোর হইয়াছে। শত শত নরচক্ষু সেই ভাবময় পুরুষের প্রতি তীব্র লক্ষ্যে অপলকে চাহিয়া রহিয়াছে! কিন্তু সহসা কি এ অত্যদ্ভুত ঘটনা! ইহা যাদুকরের মোহকরী যাদু হইতেও বিস্ময়জনক ও চমকপ্রদ। অকস্মাৎ জলদ-নির্ঘোষে "হক্ হক্—আনাল হক্" শব্দ সাধারণের কর্ণে প্রবেশ করিল, পরমুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখে, মন্সুর নাই! এই ছিল,—এই নাই। প্রাণহারী যমদূতের ন্যায় প্রহরিগণ-পরিবেষ্টিত বন্দী তপস্বী শত শত লোকের নেত্রপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না। সকলেই যথাস্থানে এক-ই অবস্থায় দণ্ডায়মান, পিপীলিকা-প্রবেশেরও পথ নাই, বাতাস নিঃসারিত হয়, এমন ছিদ্র নাই; তবে মন্সুর কোন্ শক্তিপ্রভাবে কেমন করিয়া কোন্ পথে পলায়ন করিলেন? বিদ্যুৎ চম্কাইতে যতটুকু সময় লাগে, তদপেক্ষাও স্বল্প সময়ের মধ্যে, মুখের কথা বিলীন হইতে না হইতে, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে এ কি ঘোর পরিবর্ত্তন! ইহা কি ভৌতিক ঘটনা? কে বলিতে পারে, ইহা ভৌতিক ঘটনা! ফলতঃ সকলেই নিথর-নিস্তব্ধ হইয়া পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রসনা নীরস, মুখ

মলিন, হৃদয় উৎসাহহীন, শরীর অবসন্ন! সকলেই যেন গতিশক্তিহীন প্রস্তরখোদিত প্রতিমাবৎ অবশ ও অচল! কে যেন অকস্মাৎ নয়নে ধাঁধা লাগাইয়া দিল; পূর্ব্বাপর তাবৎ ঘটনা স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল।

বিশাল প্রান্তর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ; আবার ভয়ানক কোলাহল সমুত্থিত হইল, সকলেই নানা প্রকার বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল। মন্‌সুরের ক্ষমতা অদ্ভুত, এ ক্ষমতা সাধনা-সম্ভূত, বিস্ময়ের একশেষ এ দৃশ্য ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া অনেকে তাঁহার প্রশংসা-গান করিল। নিরীহ ধর্ম্মসেবকেরা "হা আল্লাহ্! তুমিই মহান্!" বলিয়া প্রসন্নমনে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিলেন। কিন্তু মন্‌সুরের বিপক্ষ দলের মুখ রোষে, ক্ষোভে, লজ্জায় ও অপমানে মলিন—অনবত। "পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র পলায়ন করিয়াছে, হায় ধর্ম্মাবমাননার বুঝি আর প্রতীকার হয় না!" চঞ্চলমতি গোঁড়ার দল ইহাই ভাবিয়া আকুল ও রোষান্বিত হইল।

অনন্তর কি কৌশল করিলে মন্‌সুরকে আবার হাজির করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা চলিতে লাগিল; কিন্তু কেহই ভাবিয়া কোন সূক্ষ্ম উপায় বাহির করিতে পারিল না। তখন প্রধান পক্ষীয়েরা পরামর্শ করিলেন, "মন্‌সুরের প্রতি কটূক্তি ও তৎপক্ষীয় লোকদের উপর অত্যাচার করিলে নিশ্চয় তাঁহার পুনর্দর্শন পাওয়া যাইতে পারিবে। তিনি এই স্থানে আমাদের মধ্যেই 'গায়েব' হইয়া আছেন, কিন্তু আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ নয়ন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না; ফলতঃ এ কার্য্য করিলে তিনি

কিছুতেই আর গোপনে থাকিতে পারিবেন না।” এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তাঁহারা সমবেত জনমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিলেন। তাহাতে দুর্দ্দান্তস্বভাব লোকেরা আঘাত-প্রাপ্ত বিষধরের ন্যায় ক্রোধে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া ঋষিবরকে অকথ্য কটূক্তি করিতে লাগিল এবং তৎপক্ষসমর্থনকারী ও তাঁহার মতাবলম্বী সাধুদিগকে বিকৃতস্বরে বিদ্রূপ ও বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতেও আশা পূর্ণ না হওয়ায় পরস্পর ইঙ্গিতানুসারে সেই নিরীহ ব্যক্তিগণকে সজোরে প্রস্তরাঘাত পূর্ব্বক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ঘোর অরাজকতা উপস্থিত, বিড়ম্বনার একশেষ হইল; অনাচার-অত্যাচার পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। মার-ধর-সূচক হুহুঙ্কার নাদে যেন প্রবল বাত্যার সৃষ্টি হইল।

এদিকে অদৃশ্য যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এই বীভৎস কাণ্ড দর্শনে তপঃসিদ্ধ মনসুর আর সহ্য করিতে পারিলেন না। একের পরিবর্ত্তে অপরের নিগ্রহ, অপমান ও দণ্ডভোগ! ইহা প্রকৃতই অন্যায়—তাঁহার উহা ভাল লাগিল না। তাই তিনি তদ্দণ্ডে প্রেমপূর্ণ ‘আনাল হক্’ শব্দে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া —অত্যাচারী জনগণের অন্তর কাঁপাইয়া আবার সকলের দৃষ্টি-সীমার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি সেই নির্লজ্জ দুষ্টমতিগণ সক্রোধে তাঁহার উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি ত্বরিতপদে শূলাস্ত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বর্ষার বারিপাতের ন্যায় মহর্ষির

উপর আরও প্রস্তর পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সাংঘাতিক আঘাতেও তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, সাধন-সহিষ্ণুতার ফলে তাঁহার মনের ভাব পূর্ব্ববৎ অটল, তুষ্টিজনক ও বিকাররহিত! বিষাদের কালিমা-রেখার পরিবর্ত্তে হাস্যের আনন্দলহরীতে তাঁহার বদন-মণ্ডল সুশোভিত। কেননা শত্রুনিক্ষিপ্ত সেই কঠিন প্রস্তরখণ্ডসকল তাঁহার কোমলাঙ্গে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া পড়িতেছিল এবং তজ্জনিত আঘাত তিনি সুকোমল কুসুমস্পর্শতুল্য সুখদ জ্ঞান করিতেছিলেন!

এই সময়ে আর একটী বিস্ময়জনক ঘটনা সংঘটিত হইল। মহর্ষির প্রিয় সখা শেখ শিব্‌লী তাঁহার উপরে একটী পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। সেই পুষ্পাঘাতে তিনি মর্ম্মান্তিক কাতরতা প্রদর্শন করিলেন। প্রস্তরাঘাতে আনন্দ এবং পুষ্পাঘাতে যাতনা! প্রকৃতই ইহা বিস্ময়ের কথা বটে! ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে মহর্ষি সহর্ষে বলিলেন, "জানিও, ধর্ম্ম-মর্ম্মহীন অপ্রেমিক অত্যাচারীর প্রহার হইতে আমি বিমুক্ত—স্বাধীন। অন্ধের লক্ষ্য কখন কি ঠিক হইতে পারে? কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সন্ধান অব্যর্থ ও মারাত্মক। আমার সেই চিরারাধ্য প্রেমময় বন্ধুর প্রেমিক যিনি, যাঁহার সহিত আমার অন্তরের নিকট সম্বন্ধ, যিনি আমার ব্যথার ব্যথী, তিনি তৃণের দ্বারা আঘাত করিলেও কষ্টানুভব হইয়া থাকে।" পুনঃ প্রশ্ন হইল। শিব্‌লী বলিলেন,—"হে প্রিয় তাপস! 'প্রেম' শব্দটী সর্ব্বত্রই

শুনিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু প্রেমের প্রকৃত অর্থ কি, কেহই জানে না। আপনাকে সাধারণ্যে তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।" মহর্ষি মৃদুহাস্যে কহিলেন, "প্রিয় বন্ধু! প্রেমের অর্থ কি আপনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই? তবে শুনুন, প্রকৃত প্রেমের অর্থ—প্রাণদান অথবা হত্যা ও সর্ব্বসমক্ষে প্রেমিকের শব-দাহ করা। শীঘ্রই এ ঘটনা দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন।" আবার প্রশ্ন হইল, "মারফতের (আধ্যাত্মিক তত্ত্বের) অর্থ কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি মৃদুভাবে কহিলেন,—"ইহার অর্থ অতি সামান্য, অতি সূক্ষ্ম, রেণু-কণা সদৃশ। যাহা বুঝিয়াছেন, সে সমস্ত অলীক চিন্তামাত্র।" এইরূপ ধীরচিত্তে মহাজ্ঞানী মন্‌সুর বহু লোকের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলেন।

অবশেষে তেজস্বী ধর্ম্মবীর প্রসন্নবদনে শূলীদণ্ডের নিকট গমন করিলেন। তখন হুজুক-মাতোয়ারা উজির জল্লাদকে মহর্ষির পবিত্র অঙ্গে সহস্র 'কোড়া' মারিতে অনুমতি করিলেন। যদি তাহাতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, উত্তম, নতুবা তদুপরি আবার সহস্র কোড়া-প্রহারের ব্যবস্থা করিলেন। কেননা তাহাই খলিফার আদেশ। এই আজ্ঞানুসারে পাষাণপ্রাণ জল্লাদ উগ্রমূর্ত্তিতে কঠিন কোড়া-দণ্ড হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইল। "অহহ! কি করিস্—কি করিস্, রে নিষ্ঠুর, থাম্ থাম্, এ কি করিতে যাইতেছিস,—কোড়া সম্বরণ কর্!" জল্লাদের হৃদয়ের ভিতরে সহসা কে যেন এই নিষেধ-ধ্বনি উত্থিত করিল—তাহার প্রাণ কাঁপিল—হাতও যেন অবশ হইল। কিন্তু হইলে কি

হইবে ? সে-নিষেধ মানিয়া সে কি নিরস্ত হইতে পারে ? এ যে রাজার আদেশ। জল্লাদ তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র কোমল অঙ্গে— অহো সেই সুদুর্ল্ভ রক্ত-মজ্জা-মাংস-গঠিত শোভন অঙ্গে, কাঁপিতে কাঁপিতে উপর্য্যুপরি কোড়ার প্রহার করিতে লাগিল। এক—দুই—তিন, এক শত—দুই শত—তিন শত, সহস্র—দুই সহস্র, এক এক করিয়া ক্রমে সমস্ত আঘাতই ফুরাইয়া গেল। সহস্র সহস্র মানব সেই দারুণ দৃশ্য দর্শন জন্য নির্ণিমেষনেত্রে দণ্ডায়মান। কিন্তু সঙ্কল্প নিষ্ফল, সমস্তই বৃথা! মহর্ষি স্থির—শান্ত! তাঁহার গাত্রচর্ম্ম ফুটিয়া রক্তধারা বিচ্ছুরিত হইল বটে,—সর্ব্বাঙ্গ লোহিত বর্ণ ধারণ করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বেদনা-ব্যঞ্জক ভাব কোথায় ? সে বদনমণ্ডল অম্লান—প্রফুল্ল, অন্তর কাতরতার লেশ-শূন্য! ইহা দেখিয়া দুরন্ত লোকেরা ক্রোধে স্ফীত হইয়া আবার তাঁহাকে পাথর ছুড়িয়া মারিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেন না, শিলাবৃষ্টির মধ্য দিয়া শূলদণ্ড চুম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং বধ-মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তখনও প্রস্তর-পতনের বিরাম নাই, তখনও নিষ্ঠুরদের ক্রোধের উপশম হয় নাই! কিন্তু সকলে তাঁহার অবিচলিত ধৈর্য্য ও অম্লান মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইল। আর যাহারা করুণপ্রাণ, ধর্ম্ম-পথের পথিক, তাঁহাদের অন্তর চূর্ণ হইয়া গেল,—নয়নে দরদরধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

অনন্তর মহাতপা মন্সুর খোদা-তা'লার উদ্দেশ্যে উর্দ্ধমুখে হস্ত উত্তোলন করিয়া মনাজাতের পর গম্ভীর স্বরে "হক্ হক্—

আনাল্ হক্” বলিয়া দিক্ দশ বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। কি আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনা! বিধাতার কি বিচিত্র লীলা!! যে শব্দের উচ্চারণে বাগ্দাদের জনসাধারণ মনসুরের প্রাণহন্তারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিষিদ্ধ ‘আনাল্ হক্’ শব্দ তাহাদেরই রসনা হইতে অনর্গল বাহির হইতে লাগিল। কে যেন সজোরে তাহাদের রসনা-যন্ত্র ঘূর্ণিত করিয়া সেই ধ্বনি বাহির করিতে লাগিলেন। কেহই নিস্তব্ধ নহে, সকলেই সেই এক-ই ধুয়ায় উন্মত্ত। কেবল যে নর-মুখেই এই ধ্বনি, তাহা নহে; নির্জ্জীব জড়পদার্থ এবং বৃক্ষ-লতাদিও ঐ ধ্বনি বহির্গমনে ক্ষান্ত রহিল না। মানবমণ্ডলীর মুখে আনাল্ হক্, পদ-দলিত দূর্ব্বাদলে আনাল্ হক্, ইষ্টক-প্রস্তর-মৃৎখণ্ডে আনাল্ হক্, তরু-লতা-গুল্মে আনাল্ হক্, অলক্ষ্য বায়ু-সাগরে আনাল্ হক্, উড্ডীয়মান মেঘমালায় আনাল্ হক্, পশু-পক্ষি-কীট-মুখে আনাল হক্, এইরূপ যে দিকেই দেখা যায়, যে দিকেই কর্ণপাত করা যায়, সেই দিকস্থ যাবতীয় পদার্থ হইতেই ঐ একই শব্দের মুহুর্মুহু বিনির্গমন শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আহা! এতদপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়—অমানুষিক অপূর্ব্ব ঘটনা আর কি হইতে পারে? আরও আশ্চর্য্য এই যে, যাহারা বিরুদ্ধপক্ষ, তাহাদিগকেও আজ অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে আসিয়া বৃক্ষ-লতা-কীট-পতঙ্গাদির সহিত সেই একবিধ দোষেই দোষী প্রমাণিত হইতে হইল। ইহা দৈবের কৌশল, না বিড়ম্বনা? না ভক্তের মাহাত্ম্য-শক্তির এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন? কে ইহার সদুত্তর দিবেন?

বিপক্ষদল এই দৈবঘটনায় বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত ও নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া অধৈর্য্যের সহিত উচ্চৈঃস্বরে জল্লাদকে কহিল, "আর বৃথা বিলম্বের প্রয়োজন কি? আর বিড়ম্বনা কি জন্য? উহার প্রাণবায়ু যত শীঘ্র দেহ-বাস শূন্য করিয়া অনন্ত বায়ু-সাগরে মিশিয়া যায়, ততই মঙ্গল, তুমি তাহারই আয়োজন কর। ইহার সর্ব্বাঙ্গ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে— অস্থি-সন্ধি পৃথক ও চূর্ণ করিতে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না।"

উঃ কি নিদারুণ কথা! পাষাণহৃদয় নির্ম্মমগণের কি নিষ্ঠুরাদেশ!! কি অমানুষিক পৈশাচিক অত্যাচার!! শুনিলে অন্তরাত্মা উড়িয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে, শোণিত বিশুষ্ক হয়, নিতান্ত কঠোরপ্রাণও দয়ায় দ্রবীভূত হইয়া থাকে। আহা তৎকালে তথায় কি কেহই ছিল না,—মহর্ষির মহিমা বুঝিতে— গূঢ় উক্তির মর্ম্মগ্রহ করিতে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ,—নৃশংস হত্যা-কাণ্ড হইতে ধার্ম্মিককে রক্ষা করিতে সাহসী নরশার্দ্দূল কেহই কি বিদ্যমান ছিল না? বড়ই ক্ষোভের কথা, বড়ই পরিতাপের বিষয়! লেখনি! ভস্মীভূত হও, মস্যাধারে মসী বিশুষ্ক হউক। হস্ত! আজ অচল হও, এই ভীষণ শোকের কাহিনী বর্ণনা করিতে আর অগ্রসর হইও না! বিধাতঃ! এই কি তোমার ভক্তগত প্রাণ? এই কি তোমার অনুগতের কুশল-সাধন? এই কি তোমার বন্ধুত্বের প্রতিদান? ক্ষুদ্র নর আমি, বুঝিতে পারিলাম না প্রভো! এ তোমার কেমন কৌতুকাবহ লীলাখেলা!

প্রিয় পাঠক! আসুন একবার মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করুন,

কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য! ঐ দেখুন, অজ্ঞানান্ধদের আজ্ঞাক্রমে কালান্তক যমদূতস্বরূপ নির্দ্দয় জল্লাদের বিজলীবৎ চাক্‌চিক্যশালী খরশাণ তরবারি ঊর্দ্ধে উথিত হইল। মহর্ষি তন্নিম্নে মস্তক স্থাপন করিয়া ঘাতককে বিনীতভাবে কহিলেন, "ভাই জল্লাদ, শীঘ্র স্বীয় কার্য্য সম্পাদন কর। শীঘ্র এই মহাপাপীর—এই ঘোর অপরাধীর দণ্ড প্রদান কর। আমার অন্তর অহোরজনী দগ্ধ হইতেছে। যদি দেখাইবার হইত, তবে এই সমবেত বন্ধুদিগকে দেখাইতাম—জগৎকে দেখাইতাম, দেখিয়া বুঝিত। আমার হৃদয়ে সুখ নাই, মনে শান্তি নাই, অন্তর অনলপূর্ণ—তুফানময়! তুমি সেই জ্বলন্ত আগুন নিবাইয়া দিয়া বন্ধুর কার্য্য কর।"

মহর্ষির বিনীত বচন শ্রবণমাত্র নিষ্ঠুর জল্লাদ অসি-প্রহারে তাঁহার পবিত্র দেহ হইতে হস্তদ্বয় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অমনি দুই বাহু-মূল হইতে শোণিত-ধারা ঊর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ত-রঞ্জিত হইল, রক্তপ্রবাহে ধরাতল কর্দ্দমময় হইয়া গেল। অহহ কি নৃশংস ব্যাপার! কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য!! কি ভীষণ নিষ্ঠুর কার্য্য!! অকস্মাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে কত বিলাপ-ধ্বনি, কত করুণ ক্রন্দন-রোল অলক্ষ্যে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। প্রকৃতির হাস্যভরা বদনমণ্ডলে যেন বিষাদের বিষম কালিমা-কুয়াসার সঞ্চার হইল। বিশ্ব-সংসার অন্ধকারময় হইয়া গেল। অহো! তৎকালে এই অবিচার-অত্যাচারের লীলাস্থলী বসুমতী ঘন ঘন বিকম্পিত ও

রসাতল-তল-সাগরে নিমজ্জিত না হইয়া সেই পাপস্মৃতি এখন পর্য্যন্ত হৃদয়ে ধরিয়া আছে কেন, কেমনে বলিব? বিধাতার চক্র, বিধাতাই জানেন।

সহৃদয় পাঠক! বিদূষী পাঠিকে! করুণাময় বিধাতার অনুগ্রহে কথায় কথায় আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে এত দূর পর্য্যন্ত আসিলাম। কিন্তু আর পারি না—এক্ষণে মহা বিপদ—ঘোর সঙ্কট। কি সঙ্কট? তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? যাহার আংশিক অবতারণায় আপনারা শোকে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ—মর্ম্ম-বেদনায় সংজ্ঞাশূন্য—অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছেন না, সে বিপদের কথা কি এখনও বলিয়া দিতে হইবে? এমন মর্ম্মভেদী ভয়াবহ ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই, কাহার নিকটে শুনেও নাই, জগতে আর কখন ঘটিয়াছে কি না, তাহাতেও ঘোর সন্দেহ আছে। হায় কি বলিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ভাবিয়া মস্তক ঘুরিয়া যাইতেছে, কল্পনার উদ্ভাবনীশক্তি তিরোহিত হইয়াছে, হস্ত শিথিল ও রসনা অবশ, হাতের লেখনীও কম্পিত। সুতরাং আর কি বর্ণনা করিব? বর্ণনা করিবার শক্তি কোথায়? তাই বলিতেছি পাঠক! আজ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি। জানিয়া শুনিয়া—ইচ্ছা করিয়া এমন কঠিন কার্য্যে কি প্রবৃত্ত হইতে আছে? কিন্তু কি করিব, হাত নাই, যে ঔষধ গুলিয়াছি, তাহা গিলিতেই হইবে।

মহর্ষির সুপবিত্র বাহুদ্বয় ভূপতিত হইয়া রুধিররঞ্জিত ও ধূলি-ধূসরিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই সহ্য গুণের

অবতার সাধক মন্‌সুর মুদিতনেত্রে বিশ্ববিধাতার গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে সরল প্রাণে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কহিলেন, "মনুষ্যের স্থূল দৃষ্টির দৃশ্য আমার স্থূল হস্ত কর্ত্তিত হইল, কিন্তু যে হস্ত নরদৃষ্টির বহির্ভূত, আমার সেই অদৃশ্য সূক্ষ্ম হস্ত কাটিতে এ জগতের কাহারও ক্ষমতা নাই।" এই উক্তির পরেই শোণিতার্দ্র বাহুমূলে আপনার মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করিলেন, —মুখশ্রী রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইল। তখন শেখ শিব্‌লী ভগ্নহৃদয়ে কাতরকণ্ঠে তাহার কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে তিনি কহিলেন, "আমি সেই পরাৎপর পরম বন্ধুর প্রিয় কার্য্য 'নমাজ' নির্ব্বাহ করিব বলিয়া 'অজু' করিতেছি, পার্থিব জীবনের শেষ সাধ মিটাইয়া লইতেছি। ভাই! আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি না, জানিবেন; প্রেমের জন্য প্রেমিক আপনার জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে,—যথার্থ বন্ধুত্বপ্রয়াসী যিনি, তিনি বন্ধুর প্রীতি-সম্পাদনার্থ সকলই করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে পানির বদলে স্বীয় শরীরনিঃসৃত তপ্ত রক্তে 'অজু' করাই প্রশস্ত ও গৌরবের বিষয়। যে ব্যক্তি হৃদয়ের রক্ত দ্বারা 'অজু'-ক্রিয়া সমাধা না করে, তাহার 'নমাজ' সিদ্ধ নহে, সে প্রেমাস্পদের নিকট সম্মানিত নহে। তাহার চিরাকাঙ্ক্ষিত পরমপদ লাভে বঞ্চিত হওয়াও অসম্ভব নহে।" মহর্ষির এই বাক্য অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদযুগল কর্ত্তিত হইল। অমনি তিনি মুক্ত-কণ্ঠে কহিলেন, "বাগ্দাদ-বাসিগণ! এ পদ পার্থিব—নশ্বর পার্থিব পদ কর্ত্তন করা কঠিন কার্য্য নহে, কিন্তু যে পদ আনন্দময়ের

অবিনশ্বর সুখরাজ্য দর্শনার্থ ধাবমান্, বল দেখি, এ জগতে কে তাহা কাটিতে ক্ষমবান্ আছে ?"

এইরূপ নানা সৎপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইল। অবশেষে—উঃ বলিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে—অবশেষে নয়নযুগল উৎপাটিত! কি বীভৎস ঘটনা! এই নৃশংস ব্যাপারে অনেক পাষাণপ্রাণ ব্যক্তিও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। চারিদিকে হা-হুতাশ পড়িয়া গেল,—'হায়—হায়!' উচ্চ রোলে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু তবুও করুণা কোথায়? দয়া কোথায়? মমতা কোথায়? স্নেহ-সহৃদয়তা সমবেদনা কোথায়? এ ভীষণ পাপময় অভিনয়-ক্ষেত্র হইতে যেন সে-সমুদয় চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। পাঠক! ঐ দেখ দেখ, অশ্রু বর্ষণ কর, বুকে আঘাত কর আর দেখ, নিষ্ঠুর জল্লাদ মহর্ষির পবিত্র জিহ্বা ছেদন করিতে অগ্রসর! যে জিহ্বায় দিবারজনী পবিত্র 'কালাম' বিরাজ করিত, যে জিহ্বা হইতে কত উপদেশামৃত বর্ষিত হইত, পাষণ্ড ঘাতক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা তাহা কাটিতে উদ্যত হইল। তখন মহর্ষি প্রিয়ভাষে মৃদুস্বরে কহিলেন, "ভাই জল্লাদ! ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা কর, দুইটী কথা বলিয়া লই, দয়া করিয়া দুইটী কথা বলিবার অবসর আমাকে দাও।" ঘাতক অসি সংবরণ করিল। তখন রক্তাপ্লুত মাংসপিণ্ডস্থিত মস্তক ঊর্দ্ধমুখে তুলিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন,—"দয়াময়! এই দুরাচরণের জন্য ইহাদের উপর কুপিত হইও না—পরমপদ প্রদানে বঞ্চিত

করিও না। কেননা ইহারা যাহা করিতেছে, তাহা তোমারই জন্য—তোমারই গৌরব রক্ষার জন্য করিতেছে বিভো!"

এই সময়ে জনতার মধ্য হইতে এক লজ্জাহীনা বৃদ্ধা নারী উপস্থিত হইয়া বলিল, "এই সে মন্সুর, এই সেই ইস্লাম-বিরোধী ভণ্ড সাধু! মার মার, খুব মার, যেমন কর্ম্ম, তেমনি শাস্তি দাও!" ইহা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ঋষিরাজের প্রতি এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। মহাত্মা মন্সুর তৎশ্রবণে জন্মের মত পবিত্র কোর্আনের 'আয়াত' (শ্লোক) বিশেষ উচ্চারণের পর আর একবার উচ্চকণ্ঠে 'আনাল্ হক্' ধ্বনি করিলেন। অহো সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি দিগ্‌দিগন্তরে বিকীর্ণ হইতে না হইতে মহর্ষির পবিত্র মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাশায়ী হইল। সাধক-শিরোমণি ধর্ম্মবীর হোসেন মন্সুর অবিচলিত চিত্তে হাসিতে হাসিতে সাধুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, খোদা-প্রেমের অতুলনীয় খ্যাতি রাখিয়া সর্ব্বসমক্ষে পরাৎপর প্রভুর নামে সুদুর্লভ ঋষি-জীবন উৎসর্গ করিলেন। * তাঁহার পূতাত্মা নশ্বর দেহ-বন্ধন বিমুক্ত হইয়া স্বর্গীয় সমীরণ সহযোগে অলক্ষ্যে উত্থান করত সেই নিত্যধামে যোগ্য পাত্রে যাইয়া সম্মিলিত হইল,—যে ধামে শান্তি-সুখ, প্রেম-পবিত্রতা, প্রীতি-প্রফুল্লতা, আনন্দোৎসব চিরবিরাজমান, যে রাজ্যের প্রজা সকলেই সাম্যভাবাপন্ন, সদাপ্রফুল্ল—পরম

* বন্দী হওয়ার এক বৎসর পরে হিজরী ৩০৬ সালে এই নৃশংস কাণ্ড ঘটে।

সুখী, যেখানে প্রেমিকের প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা লাভ করে, পিপাসা চিরনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। আর তাঁহার দেহ? অনিত্য—অসার—একত্র সংযোজিত পরমাণুসমষ্টি দেহ? তাহা অনাদরে—অবহেলায়—বিকৃত অবস্থায় নানা নির্য্যাতন ভোগ করণার্থ ধূলায় ধূসরিত হইতে লাগিল! কেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন? সে দেহের আদরে বা অনাদরে লাভালাভ কি আছে? কঞ্চুক পরিত্যাগ করিলে সর্প সে দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না। কিসের আবশ্যক? কিন্তু পাঠক! এ সাধারণ কঞ্চুক নহে। পবিত্র আধেয় ধারণ করিয়াছিল বলিয়া এক্ষণে সেই কঞ্চুক—সেই সুপবিত্র আধার স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশে উদ্দৃপ্ত হইল।

তপস্বীর ছিন্ন শির ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইতস্ততঃ ধূলায় পতিত। নগরবাসীদের আর উদ্বেগ নাই—উত্তেজনা নাই—সমস্ত ক্ষোভ দূর হইয়াছে। কিন্তু এ আবার কি অলৌকিক ঘটনা! কি এ উদ্বেগ উপস্থিত!! সেই সমস্ত দেহাংশ ও প্রত্যেক রক্তকণা হইতে অবিরল 'আনাল্ হক্' শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। বিরাম নাই, নিমেষে নিমেষে—দমে দমে 'আনাল্ হক্' ধ্বনির উত্থান। এই ঘটনায় অনেক লোক শোকসন্তপ্ত হইল, বিপক্ষদল ক্ষোভে ও অভিমানে ম্রিয়মান। কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে ক্রোধান্ধ হইয়া খণ্ডিত দেহ ও ছিন্ন মস্তক আবার শত শত ক্ষুদ্র অংশে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহাতে আরও বিপরীত কাণ্ড ঘটিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, তদ্রূপ করিলে সমস্ত জঞ্জাল কাটিয়া যাইবে—

রোগের উপশম হইবে। কিন্তু কি মূর্খতা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তকণা হইতে যে শব্দের অবিরল উত্থান, মহর্ষির দেহ অসংখ্য অংশে বিভক্ত করিলেও কি তাহা নিবৃত্ত হইবার সম্ভব? ফলতঃ উপশম হওয়া দূরে থাক, উত্তরোত্তর উপসর্গের বৃদ্ধিই হইতে চলিল। কি জানি কোন্ শক্তিপ্রভাবে সেই অগণিত মাংসখণ্ড হইতে সমস্বরে 'আনাল্ হক্' শব্দোত্থিত হইয়া দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিল; সহসা যেন প্রবল ঝটিকায় শান্ত সাগর তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। পরিণাম আরও যে কি ভয়ানক হইবে, তাহাই ভাবিয়া সকলে চমকিত, অবাক্ ও ভয়বিহ্বল। প্রধান পক্ষীয়দের মুখ ম্লান—কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। পরন্তু ঘটনার অলৌকিকত্ব ও মহিমা এত দূর দেখিয়া-শুনিয়াও কাহারও চৈতন্যোদয় হইল না —কেহ দৈব কার্য্যের বিপক্ষতা করিতে ক্ষান্ত হইল না। হায় এতদপেক্ষা অজ্ঞানতা ও অনাচার আর কি হইতে পারে? হায় কি আক্ষেপ! তৎকালের সেই উন্মত্ত জনমণ্ডলীর হৃদয় কোন্ উপাদানে গঠিত ছিল? তাহাতে কি কোমলত্বের কণামাত্রও ছিল না? দয়া-স্নেহ-করুণা-মমতার ছায়াও কি তাহাতে কখন পতিত হয় নাই? ধর্ম্মের আদেশ পালন করিতে গিয়া অবশেষে যাহা অধর্ম্ম,—নিতান্ত নিষিদ্ধ পাপ কর্ম্ম, তাহাও সম্পাদিত হইতে চলিল! শরিয়তের—ইস্লাম-ধর্ম্মানুষ্ঠানের দৃঢ়-বিশ্বাসী আলেম-গণের মতানুসারে সকলে এক স্থানে পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপাকার করিয়া কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া ধূ-ধূ শব্দে ভয়াবহ

বিভাবসু জ্বলিয়া উঠিল! তখন সেই সমুদয় মাংসখণ্ড ও রক্ত-রঞ্জিত মৃত্তিকা সেই সর্ব্বসংহারক অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল।

অহো! মহর্ষির খণ্ডিত দেহ ভস্মাকারে পরিণত হইতে চলিল। এই বার সমস্ত যন্ত্রণার শেষ—আপদের শান্তি হইবে, লোকে বুঝিল। কিন্তু সকলই নিষ্ফল—সকলই নিরর্থক; কিছুতেই কিছু হইল না, কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। ছিন্ন অবয়বসমূহ ভস্মাকারে পরিণত করিতে প্রচণ্ড হুতাশনের সাহস হইল না—মাংসরাশি কিছুতেই পুড়িল না।* অধিকন্তু হিতে বিপরীত ঘটিল! সেই নিষিদ্ধ 'আনাল্ হক্' শব্দের আবার প্রসার বাড়িয়া গেল। সেই ধ্বনি প্রদীপ্ত অনল ও তজ্জাত ভস্ম হইতেও ঘন ঘন উত্থিত হইতে লাগিল। কি জ্বালা! এত করিয়াও এ বিপদের নিরাকরণ নাই। সকলের আপদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, হতাশে হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাদের প্রতি কেশরন্ধ্র হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে সকলে দারুণ ক্রোধের বশে সেই সব মাংসখণ্ড ও ভস্মাদি দেশান্তরিত করণার্থ পরামর্শ করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। উহা 'আনাল্ হক্' শব্দে সৈকতভূমি কাঁপাইয়া, বারি-রাশি মাতাইয়া স্রোতোবেগে অকূল পাথারে ভাসিয়া চলিল।

এক্ষণে বলুন দেখি পাঠক! এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ কি? উত্তর—নিয়তি-লিপি। নিয়তি-লিপি অবিচল—অনিবার্য্য।

* কেহ কেহ বলেন, মহর্ষির খণ্ডিত দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। কিন্তু একখানি বিশ্বস্ত গ্রন্থে তাঁহার মহিমময় দেহ ভস্মীভূত হয় নাই বলিয়া বর্ণিত আছে। আমরা তাহাই বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

সে লিপির লিখন খণ্ডন করিতে কাহারও সাধ্য নাই। এক দিন আল্লাহ্-তা'লা অদৃষ্টফলকে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন—প্রস্তরাঙ্কিতবৎ জ্বলন্ত অক্ষরে আঁকিয়া দিয়াছেন, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে—বিন্দু পরিমাণে তাহার 'নড়্‌চড়্' হইবার নহে! সসাগরা পৃথিবীর প্রচণ্ডবিক্রম সার্ব্বভৌম নরপতি ও দীন-হীন নিরাশ্রয় পথের ভিখারী, পরমধার্ম্মিক নিত্য-জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষ ও পরস্বাপহারী সদা-কদাচারী দুর্দ্দান্ত দস্যু, অগাধ মনীষাসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও হিতাহিত-বোধহীন নিরক্ষর মূর্খ, দিব্যলাবণ্য-পরিশোভিত বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ ও চলচ্ছক্তিবিরহিত লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ, নবযৌবনগৌরবিণী রূপবতী কামিনী ও রূপযৌবনবিগতা পলিতকেশা প্রবীণা, পবিত্র-সলিল-স্নাত প্রিয়দর্শন বালক ও উদ্‌গতোন্মুখী শুদ্ধমতী সুকুমারী বালিকা, সকলেই নিয়তির অধীন—সকলেই সুখে দুঃখে নিয়ত নিয়তির পূজা করিয়া থাকে। তাই পুনঃ বলিতেছি, বিশ্বসংসারে নিয়তির সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ কেহই নহেন। নিয়তি সর্ব্বোপরি প্রবল। বিশ্ববিশ্রুত মহাবীর রোস্তম বীরত্ব-মহিমায় শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বটে, কিন্তু নিয়তির নিকটে তাঁহাকেও মস্তক নত করিতে হইয়াছিল। বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের নামে এক দিন পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনিও নিয়তিকে কম্পিতাঙ্গে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিয়তির অলঙ্ঘ্য প্রভাবে সকলেই আবদ্ধ—নিয়ন্ত্রিত। আজ সেই নিয়তি-চক্রে নিপতিত হইয়া ঋষিরাজ মনসুরও আপনার জীবন ও গৌরব-গুরুত্ব বিসর্জ্জন করিলেন।

উপসংহার

সাগরের সীমা নাই। সাগর অসীম, অনন্ত, অতলস্পর্শ ও সুদূর-প্রসারিত। সাগরের যে দিকে তাকাও, দেখিবে অনন্ত বারিরাশি হৃদয়ে ধরিয়া বিস্তীর্ণ মরুস্থলীর ন্যায় সাগর ধূ-ধূ করিতেছে। পবিত্র মাংসখণ্ডসমূহ স্রোতের আকর্ষণে এই সুদূর সাগরে আসিয়া পড়িবে ও বিলুপ্ত হইবে বলিয়া তাহা সরিৎ-সলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। লোকে ভাবিয়াছিল, এইবার অলৌকিক অভিনয়ের যবনিকাপতন হইল—চিন্তার অবসান হইল। কিন্তু আবার কি এক বিস্ময়কর অভিনব কাণ্ড! ঋষি-রাজের স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত দেহাংশসমূহ সরিৎ-সলিলে নিক্ষেপ করিবামাত্র জলরাশি প্রবল তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং নিক্ষেপকারীদিগকে আক্রমণ করণার্থ কূলাভিমুখে ধাবিত হইল। বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া, ভাসমান জলযানাদি বিপর্য্যস্ত করিয়া জলোচ্ছ্বাস তীরস্থিত ব্যক্তিবৃন্দকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বুঝি বা নগরও ডুবিয়া যায়! কি ভীষণ দৈব বিড়ম্বনা! তখন সকলেই আসন্ন বিপদে রক্ষা পাইবার জন্য পলায়নোদ্যত হইল,—যে যে-দিকে পারিল প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু স্রোতের প্রচণ্ড আঘাত অনেক-কেই সহ্য করিতে হইল। কত জন নিমজ্জিত, কত জন ভূপতিত

ও কর্দ্দমাক্ত হইল, কেহ কেহ বা অন্য কাহারও বস্ত্র বা হস্তাদি ধরিয়া আপনাপন প্রাণরক্ষায় চেষ্টিত হইল। "পলাও—পলাও" ভয়ানক কোলাহলসহ জলোচ্ছ্বাসের অগ্রে মানব-স্রোত বহিয়া চলিল।

এদিকে মহর্ষির জনৈক প্রিয় শিষ্য এই ভীষণ ঘটনায় শান্তি স্থাপনার্থ সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। মহর্ষি জীবনকালে একদা এই শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "আমার ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নদীতে নিক্ষিপ্ত হইলে যখন বারিরাশি স্ফীত হইয়া লোকদের অনিষ্ট কামনায় প্রধাবিত হইবে, তখন তুমি আমার জীর্ণ 'খের্কা' (বৈরাগ্য-বস্ত্র) অবিলম্বে জলোপরি নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে উচ্ছ্বসিত জলরাশি অবনত ও শান্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবে এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গও অনিষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।" মহর্ষির এই উপদেশানুসারে তাঁহার সেই শিষ্য যথাকালে সেই পবিত্র 'খের্কা' ক্ষিপ্রহস্তে উত্তাল তরঙ্গোপরি নিক্ষেপ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! অমনি উচ্ছ্বাস-উদ্ধত জলরাশি প্রশান্তভাবে নিস্তব্ধতা অবলম্বনে স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত হইল—যেন উর্দ্ধোত্থিত অনল-শিখায় বারিবৃষ্টি হইল, ক্রোধোদ্দীপ্ত বিস্তৃতফণ ফণীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিল। হায়, সব ফুরাইল!

পাঠক! এক্ষণে বলুন, ইহা কি মহর্ষির মাহাত্ম্যের পরিচায়ক নহে?—তাঁহার অকৃত্রিম ধ্যান-ধারণার জাজ্বল্যমান প্রমাণ নহে? জনসাধারণে অবশেষে বিপন্মুক্ত হইয়া স্থিরচিত্তে এই অত্যাশ্চর্য্য

ঘটনার বিষয় ভাবিয়া মর্ম্ম বুঝিল এবং একেবারে চমৎকার-রসে অভিষিক্ত হইয়া গেল, ঘটনার অলৌকিকত্বে সকলের অন্তরে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হইল। কেহ হাস্যমুখে, কেহ চিন্তাভারাবনত অন্তরে, কেহ বা প্রকাশ্য অনুশোচনার সহিত স্ব স্ব ভবনমুখী হইল। বাগদাদের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে দিবারজনী এই অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।

পরিশেষে সৎকার-ব্যবস্থা। নগরবাসীরা বিপক্ষ, কিন্তু তাই বলিয়া মহর্ষির শিষ্যবর্গ কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইবেন কেন? তাঁহারা সমবেত হইয়া মহর্ষির অন্তিম সৎকার করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং ব্যথিত অন্তরে খুঁজিয়া খুঁজিয়া অস্থিমাংস সংগ্রহ পূর্ব্বক শাস্ত্রসঙ্গত বিধানানুসারে সমাধি প্রদান করিলেন। হায়! এইরূপে এক জন অসাধারণ তেজস্বী, অমানুষিক জ্ঞানগরীয়ান্, অতুলনীয় তত্ত্বদর্শী, অলৌকিক কার্য্যক্ষম ও নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ তাপসের পবিত্র জীবনাভিনয়ের যবনিকা পতন হইল।

সম্পূর্ণ
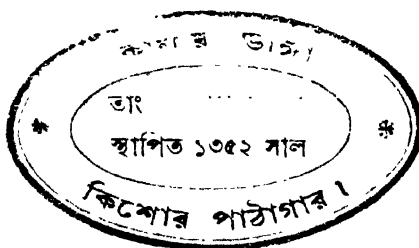
কবিবর মোজাম্মেল হক্ প্রণীত গ্রন্থাবলী

হজরত মোহাম্মদ—হজরতের পবিত্র চরিতামৃত সুমধুর কবিতায় গ্রথিত। পঞ্চম সংস্করণ; মূল্য দুই টাকা মাত্র। **'ভারতবর্ষ'** বলেন,—"মহাপুরুষের জীবন যেমন পবিত্র, জীবনী-লেখকও তেমনি পবিত্রভাবে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।" **'প্রবাসী'** বলেন,—"পুস্তকখানির রচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে।" **'হিতবাদী'** বলেন,—"লেখক সুকবি; বর্ণনায় তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি। পুস্তকখানিতে সর্ব্বত্র লেখকের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।" **'সঞ্জীবনী'** বলেন,—"এই পুস্তকখানিতে ধর্ম্মবীর মোহাম্মদের জীবন-কাহিনী সুন্দর করিয়া বিবৃত হইয়াছে। ইহার ভাষা চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানি পাঠ করিলে লেখকের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আশা করি, এই পবিত্র চরিতামৃত সর্ব্ব সম্প্রদায়ের আদরের সামগ্রী হইবে।"

শাহ্‌নামা—বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য পারস্য 'শাহ্‌নামা'র গদ্যানুবাদ। অভিনব তৃতীয় সংস্করণ; মূল্য তিন টাকা। **'প্রবাসী'** বলেন—"এই গ্রন্থের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলে একখানি জগৎ-বিখ্যাত কাব্যের পরিচয় লাভ করা বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ হইয়া যাইবে, এজন্য গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ। তিনি যে বিরাট্ কর্ম্মে হাত দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে বঙ্গভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।" **'বঙ্গবাসী'** বলেন,—"শাহ্‌নামা পাঠ করিলে একাধারে ইতিহাস ও উপন্যাস পাঠের সুখ অনুভূত হয়।" **'আনন্দ বাজার পত্রিকা'** বলেন,—"গ্রন্থকার বহু গ্রন্থ লিখিয়া বাঙ্গলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 'শাহ্‌নামা' তাঁহার বিপুল শ্রমের ফল। পড়িতে বসিলে মনে হয় না যে, অনুবাদ পড়িতেছি। প্রাচীন ইতিহাস ও কিম্বদন্তীর কাহিনীগুলি কেবল কৌতূহলোদ্দীপক নহে; ইহার মধ্যে শিখিবার ও জানিবার অনেক বিষয় আছে। মহাকবি ফেরদৌসীর কবিত্বশক্তির ও রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় এই গদ্যগ্রন্থে গ্রন্থকার যে-ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাহা তাঁহার শক্তির পরিচায়ক।"

ফেরদৌসী-চরিত—প্রাচ্যরাজ্যের 'হোমার' মহাকবি ফেরদৌসীর জীবন-বৃত্তান্ত। প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত। একাদশ সংস্করণ; মূল্য দেড় টাকা। **'প্রবাসী'** বলেন,—"ভাষা ও রচনা-প্রণালী উত্তম। যাঁহারা এই জীবন-চরিত পড়িবেন, তাঁহাদের এই কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'শাহ্‌নামা' পাঠ করা উচিত এবং যাঁহারা 'শাহ্‌নামা' পড়িবেন, তাঁহারা অবশ্য 'শাহ্‌নামা'র কবির কাহিনী পড়িবেন।"

তাপস-কাহিনী—বড় পীড় সাহেব, নিজামউদ্দীন আউলিয়া প্রভৃতি সাত জন তাপসের জীবন-কাহিনী। **'প্রবাসী'** বলেন,—"এই গ্রন্থে মুসলমান মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনীর প্রসঙ্গে এমন সমস্ত উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে, যাহা সকল সম্প্রদায়ের লোকের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য।" ষষ্ঠ সংস্করণ; মূল্য দেড় টাকা।

টীপু সুলতান—মহীশুর রাজ্যের শেষ স্বাধীন নরপতি মহাবীর টীপু সুলতানের জীবন-কাহিনী। দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। **'আনন্দ বাজার পত্রিকা'** বলেন,—"অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধকারে 'স্বাধীনতা'র এক জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ টীপু সুলতান। ভারতের ইতিহাসে এই সাহসী বীরের আত্মোৎসর্গ অমর হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার জীবন-চরিত শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার সযত্নে ঐতিহাসিক প্রমাণসহ গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইতিহাস ও জীবন-চরিত দুই দিক্ দিয়াই গ্রন্থখানি বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।"

জাতীয় ফোয়ারা—প্রণোন্মাদিনী উচ্ছ্বাসময়ী সামাজিক কাব্য। নিদ্রিত সমাজের কর্ণে প্রাণস্পর্শী উদ্বোধন-সঙ্গীত। **'প্রবাসী'** বলেন,—"মুসলমান সমাজকে উন্নতির পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া চালিত করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত উচ্ছ্বাস। স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাস-প্রবাহের মধ্যে কবিত্বের আভা পড়িয়া চিক্-চিক্ করিয়া উঠিয়াছে।" তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

জোহ্‌রা—সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। ভারতবর্ষ, অমৃত বাজার, বেঙ্গলী, মুসলমান প্রভৃতি ইংরাজী বাঙ্গলা পত্রিকায় ভূয়সী প্রশংসিত। তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। **'নায়ক'** বলেন,—"এই

উপন্যাস-প্রপীড়িত দেশে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের এমন একটী নিখুঁত চিত্র মৌলভী সাহেব আমাদিগকে দেখাইয়া বাধিত করিয়াছেন। তাঁহার 'জোহ্‌রা' মৌলিক গ্রন্থ, ইংরাজী গল্পের উদ্ভট অনুবাদ নহে। সাহিত্যামোদী হিন্দুমাত্রকেই আমরা 'জোহ্‌রা' পাঠ করিতে অনুরোধ করি। হিন্দু-মুসলমানে ভাব করিতে তো চাও, অথচ আধুনিক হিন্দু আধুনিক মুসলমানকে চিনে না—জানে না। 'জোহ্‌রা' সে অভাব দূর করিবে—তোমাকে মুসলমান সমাজের ছবি দেখাইয়া দিবে।"

হাতেম তাই—বালক-বালিকাদের চিত্তহারী শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ। উপহার দিবার অতি উপাদেয় পুস্তক। সেই অতীত যুগের অমর কাহিনী—সেই বিশ্ববিখ্যাত দানবীর পরোপকারী হাতেমের অদ্ভুত কাহিনীপূর্ণ জীবন-কথা। দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

কবি শাহাদাৎ হোসেনের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ

কল্প-লেখা

কল্প-লেখা কাব্যকুঞ্জের স্বপ্নের ফুল, সৌন্দর্য্যের তাজমহল, কল্পনার সুরধুনী, ভাবের অলকানন্দা।

'আনন্দ বাজার পত্রিকা' বলেন,—"খ্যাতনামা কবি শাহাদাৎ হোসেনের কয়েকটী উৎকৃষ্ট কবিতা এই গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। 'ভগ্নবীণা', 'কবি', 'উপেক্ষিত' প্রভৃতি কবিতাগুলি বঙ্গ-বাণীর চিরন্তন সম্পদ। এই কবির ভাবের স্বচ্ছ নির্ম্মলতা, শব্দপ্রয়োগ এবং ছন্দের স্নিগ্ধ রূপ মনকে সত্যই কাব্যের কল্পলোকে লইয়া যায়। কাব্যামোদী সমাজে **কল্প-লেখার** আদর হইবে।" মূল্য এক টাকা মাত্র।

নজরুল ইস্‌লামের কথা-সাহিত্যে অতুলনীয় গ্রন্থ

ব্যথার দান

'আনন্দ বাজার পত্রিকা' বলেন,—"**ব্যথার দান** একখানি **গদ্যকাব্য**। তরুণ কবির ব্যথা-ভারাতুর যৌবনের অর্দ্ধনগ্ন স্মৃতির রাগরক্তে অনুরঞ্জিত কাহিনী এই কাব্যের কথাবস্তু। সমস্ত কাহিনী-গুলির উপর মৃত্যুর মসীগাঢ় ছায়া নিদারুণ ভবিতব্যতার মত রহিয়াছে। তাই সেই ছায়ার অবগুণ্ঠনে প্রেমকরুণ হৃদয়ের ব্যথা-ক্রন্দন আপনি করুণ হইয়া উঠিয়াছে।" সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক **'অরণি'** বলেন,—"বাঙলার কাব্য-জগতে রবীন্দ্রমানসের প্রাবল্যের যুগেও যিনি আপন স্বকীয়তায় জাতীয় কবির সম্পূর্ণ এক নূতন তেজস্বী ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি কাজী নজরুল ইস্‌লাম। কবি নজরুলকে সেই ভাবেই বাঙলা দেশ চিনে এবং বিশিষ্ট আসন দেয়। **'ব্যথার দান'** অবশ্য কবিমনের আর এক প্রকাশ। **'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'** যে-হিসাবে বাঙলা-সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং যেভাবে বিদগ্ধজনকে মুগ্ধ করে,—**'ব্যথার দান'**-এর রস-আবেদন তাহাই। কবিমনের এবং শিল্পীর রঙের সমস্ত কমনীয়তা লইয়া বাঙলার সমতলক্ষেত্রে গোলেস্তাঁ, চমন, বেলুচিস্তানের আখরোট-ডালিমের বন এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে—অনস্বীকার্য্য। কর্ম্মক্লান্ত জীবনের মাঝখানে অবসর-লালায়িত নিভৃত একটা মন আছে—সেখানে কবির বিরহ-মিলন-কাহিনীর সার্থক আবেদন মুগ্ধতা আনে আর এক কালের, আর এক জগতের। বইটীর **পঞ্চম** সংস্করণে সে

পুরাতন কথার উল্লেখ বাহুল্য।" **'অমৃত বাজার পত্রিকা'** বলেন,—"If you are in the least interested in Bengali literature we need not introduce to you Kazi Nazrul Islam. The volume under review has already gone through several editions and as such needs no commendation. You will be charmed by the poet's colour of imagination, rare delicacy of thought, mastery over language, powerful and moving descriptions and the subtle power of analysis. You will have a feast of the honey of Parnassus in prose. If you have not got a copy, have it at once." **'আনন্দ বাজার পত্রিকা'** বলেন,—"কাজী নজরুল ইস্‌লামের পরিচয় বাঙ্গলার পাঠকগোষ্ঠীকে নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। পুস্তকের **পঞ্চম সংস্করণ** প্রকাশিত হওয়াতেই বুঝা যায় যে, বইখানি কিরূপ সমাদৃত। বিরহী কবির প্রেমিক হৃদয়ের বেদনা ইহাতে বিভিন্নরূপে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।"

পঞ্চম সংস্করণ ; সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধা। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

হিমালয় অভিযান

রঙীন প্রচ্ছদপট ও বহু চিত্র-শোভিত। চতুর্থ সংস্করণ ; মূল্য বারো আনা মাত্র। **'আনন্দ বাজার পত্রিকা'** বলেন,—"হিমগিরির অভ্রভেদী শৃঙ্গগুলি মানুষের চিরন্তন বিস্ময়। আজ মানুষের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা দুর্জ্জয়কে জয় করিবার অভিযানে বাহির হইয়াছে। হিমালয়ের শৃঙ্গে আরোহণের বহু চেষ্টা হইয়াছে। তাহারই কৌতূহলপ্রদ ভয়াবহ বিবরণ

অতি সুন্দর ভাষায় লেখা। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের লেখনীর প্রসাদগুণে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য ও মনোহর হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষার ও সাহিত্যের সম্পদ।" **'টীচার্স জর্ন্যাল'** বলেন,—"গ্রন্থকার যেরূপ সরল ও হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। ইহা হইতে ছাত্র-শিক্ষক নির্ব্বিশেষে সকলেই অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। **শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ যদি ইহাকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেন, তবেই ছাত্রগণ ইহা হইতে উপকৃত হইবে।** এইরূপ পুস্তকপাঠে বালকের মনে ভ্রমণ-স্পৃহা ও দুর্জ্জয় বিঘ্ন-বিপদকে জয় করিবার বাসনা জাগরিত হয়। আমাদের মতে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। এই দশ আনার পুস্তক হইতে দশ শত টাকার জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়।" **'অমৃত বাজার পত্রিকা'** বলেন,—"It is written in the simplest possible language. The boys and the girls will be charmed by the description. It is a sort of pictorial geography of the Himalayan ranges. The booklet will stir the imagination of the younger generation and fill their minds with a spirit of adventure."

সান-ইয়াৎ-সেন—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। চীনের নবজন্মদাতা চীন গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা সান-ইয়াৎ-সেন-এর রোমাঞ্চকর জীবন-কাহিনী। **'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'**বলেন,—"এই পুস্তক প্রত্যেক বালক ও যুবকের প্রণিধানসহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ পুস্তক প্রকাশ হইতে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। এইরূপ গ্রন্থ যতই প্রকাশিত হইবে,দেশের উন্নতি ও মঙ্গলের পথ ততই শীঘ্র উন্মুক্ত হইবে।"

কবি শাহাদাৎ হোসেনের নবতম নাট্য-অবদান

আনারকলি

মোগল-হেরেমের মর্ম্মন্তুদ করুণ কাহিনীর অপরূপ নাট্যরূপ। কবিত্ব এবং নাটকীয় উপাদানের অপূর্ব্ব সমন্বয়। যুগোপযোগী অভিনয়ের এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নাটক আপনি বোধ হয় এর আগে আর কখনো দেখেননি। কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রে প্রশংসার সহিত অভিনীত। দাম মাত্র এক টাকা। **'দৈনিক আজাদ'** বলেন,—"বর্ত্তমান নাটকটীতে ভাষার চাতুর্য্যে ও ডায়লগে তিনি যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। চরিত্র-অঙ্কনে গভীরতম ও নিখুঁত রূপায়নের সৃষ্টি আমাদের অভিভূত করে। প্রতিটী চরিত্র যেন রক্ত-মাংসে গড়া একটা একটা জীবন্ত মূর্ত্তি আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে, কথা কয়, হাসে, কাঁদে। বর্ণনায় নিপুণ শিল্পীর কৃতিত্ব আছে। গানগুলিও সুলিখিত। বই-এর প্রচ্ছদপট সুরুচিসম্পন্ন। নাটকটীর প্রভূত প্রচার হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।"

'অমৃত বাজার পত্রিকা' বলেন,—"One of the most stimulating periods of the Moghul period live and breathe in the pages of this playlet by the well-known poet shahadat Hossain. The tomb of Anarkali of Iran in Lahore testifies to the love of Prince Salim for this charming beauty who was accused of espionage and buried alive. You will make it a point to go through this neat and stylish playlet."